সেজমামার চন্দ্রযাত্রা

আমার ছোটকাকা মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, 'এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে তো এতো নাচানাচি করিস, সে কথা শুনলে আমার হাসি পায়। কই, এতো খরচাপাতি, খবরের কাগজে লেখালেখি করেও তো শুনলাম না, কেউ চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে! তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ!'

আমরা তখন বলি, 'তার মানে? কী বলতে চাও, খুলে বলো না।'

ছোটকাকা বলেন, 'তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু একটা তেমন আজকালকার ব্যাপার নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।'

আমরা তো অবাক!—'একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাও নি?'

ছোটকাকা বইয়ের পাতার কোণা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পুজোর ছুটিতে গেলাম মামার বাড়িতে। সেজমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকেরা খুব যে খুসি হয় বলে মনে হয় না, আর সেজমামা তো নয়ই। তাছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিলো না।'

সেখানে পৌঁছে দেখি, সেজমামা কোত্থেকে একটা লড়ঝড়ে মোটর গাড়ি যোগাড় করে আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগের চেয়ে যেন একটু ভারি-ভারি লাগছে। হ্যাঁরে, তোর ওজন কতো রে?'

কিছুদিন আগেই স্কুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম, 'আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।'

সেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার বেশি কেন? সে যাকগে,

ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ, চল্ তোকে একজায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।'

সেজমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমি তো অবাক, 'তুমি আবার গাড়ি চালাতে পারো নাকি?'

সেজমামা বেজায় রেগে গেলেন, 'কী যে বলিস! আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারবো না? বলে কি না যে আমি—যাক্‌গে, চল্ তো এখন।'

সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনো যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার ওপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া, দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সেটা সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায়, কুণাল মিত্তির নাকি নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, যে-সব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপন ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, ওপরটা চ্যাপ্টা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভিতরে দেখা যাবে কিছু। তার ওপর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে বাড়ি-কাঁপানো গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দু'জোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোট কথা, কেউ ওদিকে বড়ো একটা যায় না। চারদিকে দু'-তিন মাইলের মধ্যে কারো বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ, আগাছায় ভরা।

সেইখানে তো গেলেন আমাকে নিয়ে সেজমামা। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার ওপরে চড়লো। তারপর প্যাঁক-প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেলো খুলে। আমরাও ভেতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফলবাগান, একতলা লম্বা একটি বাড়ি, তার বারান্দায় একটা বড়ো কালো বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

অমনি চারিদিক থেকে দলে দলে চাকরবাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামালো। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফর্সা কোঁকড়া চুল, বেঁটে মোটা, বয়স বেশি নয়। সেজমামাকে

ফিসফিস করে বললাম, 'ঐ নাকি সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির, যাকে কেউ চোখে দেখেনি।'

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, 'কেউ চোখে দেখেনি কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি। বিশ্রী দেখতে।'

সেজমামা বললেন, 'আহা, বড়ো কথা বলিস। ঐ তোর দোষ। কিছু মনে করো না, মনোহর—উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুণাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন। জানিস তো, মিত্তিররা কী রকম চালাক হয়।'

মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, 'আর তুমিও তারচেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না।—কী যেন নাম তোমার বললে?'

বললাম, 'আগে বলিনি, এখন বলছি—ইন্দ্র।'

খুসি হয়ে বললেন, 'ইন্দ্র? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার, সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে কম বলো দিকিনি।'

চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

আমার চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাবো নাকি আমি?

বললাম, 'সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাবো না। তাছাড়া, আবার ফিরে আসবো তো? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট বলা আছে কিন্তু।'

সেজমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষে মনোহরবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ—তা ফিরে আসবে বইকি, যাবে আর আসবে না, সে কি একটা কথা হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কিসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে।'

গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা জায়গায়। তার মাথার ওপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে, আগাটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমিই আগে ঢুকলাম।

গিয়ে যা দেখলাম সে আর কী বলবো। আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়মের

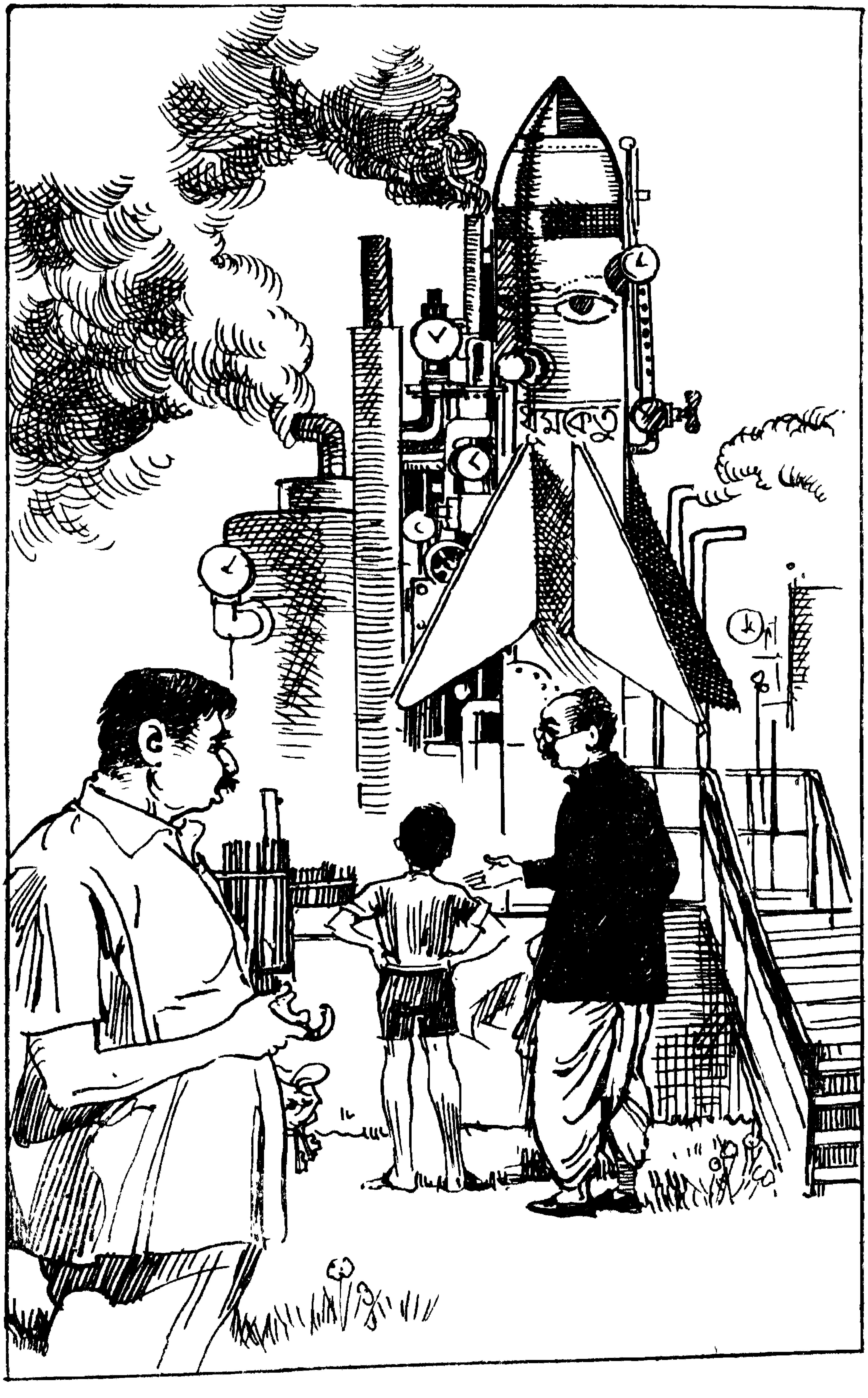

গিয়ে যা দেখলাম সে আর কি বলব।

মত কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র, অবিকল উড়ুক্কু মাছের মত দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুৎ করে তীরের মত ওপরে উঠে, নীল আকাশের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পক্ষে সেরকম কিছুই শক্ত হবে না।

নিচে একটা গোল প্ল্যাটফর্ম ওটাকে চারিদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারো নিচে যন্ত্রটার আরো অনেকখানি রয়েছে। রূপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা 'ধূমকেতু'। আর একজোড়া এই বড়ো বড়ো চোখ আঁকা। আশেপাশে কতো রকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বোঝা গেলো—একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না!

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হালকা হওয়া চাই। এই বেদে, দেখ তো ওর পকেটে কী।'

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, 'এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাবো না বলে রাখলাম।'

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওরকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিনি? কেউ রাজিও হবে না, তাছাড়া তোর প্যাণ্টের মাপে সব তৈরি! এখন না গেলে যে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে! বলছি, আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ-মেম্বার করে দেবো।'

ওঁর হাত ধরে বললাম, 'দেবে তো ঠিক? বাবা—সেজমামা কতো চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে—'

মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, 'বলছি করে দেবো, আবার অতো কথা কিসের? ফিরে তো এসো আগে।'

বেদে বললো, 'যদি আসো!'

মনোহরবাবু তাকে ধমক দিলেন, 'তোমাকে অতো কথা বলতে কে বলেছে বাছা? যাও, নিচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিনি, নইলে—'

বেদে অমনি একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেলো।

সেজমামা মনোহরবাবুকে বললেন, 'ফিরে আসার কলকব্জাগুলো ওকে বুঝিয়ে দিও মনোহর।'

মনোহরবাবু বললেন, 'ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান?'

আমি বললাম, 'আরে না না, আমার দুটো ভাই, দুটো বোন।—আচ্ছা, লাইফ-মেম্বার করে দেবেন তো? কারণ বাবা হয়তো চাঁদা দেবেন না।'

মনোহরবাবু বললেন, 'তাই দেবো। পকেটে কী আছে বের করে এইখানে রাখো তো দেখি।'

মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ-শোঁ করতে লাগলো। মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু লেত্তি, ইয়ো-ইয়ো রুমাল, নীল গুলি, রুমেনিয়ার দুটো ডাকটিকিট—মনাদা দিয়েছিলো—আধঠোঙা নরম ঝাল ছোলা ভাজা, টর্চ, আমার বড়ো গুলতিটা আর এক কৌটো শট বের করে রাখলাম। মনোহরবাবু তো অবাক!

'এসব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোট বই আর পেনসিলটা নেবে। কী দেখবে, না দেখবে, শরীরে কেমন বোধ করবে, সব টুকে রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে কখন পৌঁছোলো ইত্যাদি—ও কি হলো, চলে যাচ্ছো যে।'

আমি বললাম, 'গুলতি শট না দিলে আমি যাবো না।'

সেজমামা বললেন, 'থাকগে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে, তুমি বরং আর কাউকে দেখো।'

মনোহরবাবু বললেন, 'বেশ, তা হলে আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুণি অন্য লোক দেখছি।'

সেজমামা চুপ। আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে সেজমামা? আমার গুলতি দিলেই আমি যাবো। অবিশ্যি বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেবো। আর বলেছি তো—একা যাবো না।'

মনোহরবাবু চটে গেলেন, 'একা যাবো না আবার কী? জানো, ঐ কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু'-তিনবার একা গেছে, কিচ্ছু বলেনি।'

বললাম, 'চাঁদ অবধি গেছে?'

মনোহরবাবু বললেন, 'চাঁদ অবধি গেছে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা পেনসিলটা ঐ যে ছোটো হাউই-মতন দেখছো, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই—আচ্ছা সে যাকগে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায়, দেখো।'

বলে আমার মুখে কী একটা হলদে বড়ি পুরে দিলেন, সে যে কী

আশ্চর্য বড়ি আর কি বলবো। খেতেই মনে হলো, আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়িমাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকোলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি! একেবারে পেট ভরে গেলো। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, 'এই নাও একমাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি কোনোদিন খেও না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে, যন্ত্রের ভেতর আঁটবে না। এসো, এই আরাম কেদারাটাতে বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।'

বলে সেই লম্বা চোঙার মতো যন্ত্রটার গায়ে একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎকার হাওয়ার গদি আঁটা-চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধহয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি, সেজমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলতি দিলে না? গুলতি না দিলে যাবো না, বলেছি না।'

অভ্রের মুখোশের ভেতর থেকে কথা শোনা গেলো কিনা, জানি না। কিন্তু সেজমামার বোধ হয় একটু মন কেমন করছিলো, কাছে এসে কি যেন বলতে লাগলেন, একবর্ণ শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের শোঁ-শোঁ গোঁ গোঁতে কান ঝালাপালা! দারুণ রেগে গিয়ে সেজমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, 'দাও বলছি, গুলতি না নিয়ে আমি কোথাও যাই না।'

এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে ঠেলে সেজমামাকে সুদ্ধ ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

বাব্বা! দিব্যি ফাঁকা ছিলো ভেতরটা, সেজমামা ঢোকাতে একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেলো। নড়বার-চড়বার জো রইলো না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিলো না, সেজমামা চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরবো কি করে?'

তা কে কার কথা শোনে। ভীষণ জোরে ফুলে উঠে বোঁ করে যন্ত্রটা

আকাশে উড়ে গেলো। একবার মনে হলো, চারদিকে চোখ-ঝলসনো আলো, তারপরেই মনে হলো ঘোর অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর নড়ছে না চড়ছে না; কাত হয়ে পড়ে আছে, আমি বসে বসেই শুয়ে আছি, সেজমামা আমার তলায় একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, 'আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কিনা?'

বুঝলাম, ওঁর নিজের হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জ্বালালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, ভেতরকার কলকব্জা সব ঠিক আছে, যে যার জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ পাশের জীপ ফাস্‌নার খুলে মুখোস নামিয়ে ফেললাম!

অমনি এক ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগলো। আঃ, চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সেরকমটি হয় না।

সেজমামা বললেন, 'খাসা উড়ো কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেই-ছিলো যে নামবার সময় এতোটুকু ঝাঁকানি লাগবে না; এতোটুকু ভাঙবে না, টসকাবে না।'

আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ।

বললাম সে কথা সেজমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এরচেয়ে কতো উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজমামা শুধু একটু কোঁৎ করে উঠলেন।

বেরিয়ে বুঝলাম, বোধ হয় চাঁদের কোনো একটা নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারদিকে মনে হলো নরম ঘাস, মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোণা দিয়ে বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম! ঠিক যেন আর একটা চাঁদ। মনে হলো, আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেলো।

তখন কানে এলো যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজমামা মহা চেঁচামেচি

লাগিয়েছেন, 'টর্চের আলো দেখা, আমিও নামবো।'

অনেক কষ্টে নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেই বললেন, 'খিদেয় পেট জ্বলে গেলো, সেই বড়ি একটা দে-না।'

টের পেলাম, আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দুজনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখ-সওয়া হয়ে এলো। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিলো।

সেজমামা বললেন, 'কী রে, উঠে একটু দেখবি না?'

বললাম, 'ভোর হোক আগে।'

সেজমামা বললেন, 'আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উলটো পিঠ হয়ে থাকে তাহলে তো ভোরই হবে না।'

এবারে উঠলাম। 'তাই-ই নিশ্চয় সেজমামা। এ পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখছি, রাতেও দেখেছি।'

"ফোঁস।"

তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম! ফোঁস করলো কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জন্তুটা কচর-মচর করে নরম ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সেজমামা বললেন, 'তবে কোনো ভয় নেই। ওরা নিরামিষ খায়।'

আবার শুনলাম জোরে একটা ফোঁস ফোঁস! আমার মোটেই ভালো লাগলো না। সেজমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কী হবে রে?'

'কী আবার হবে?' এক নিমেষে গুলতিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলো, সে আর কী বলবো। একটা কেন, মনে হলো এক লাখ জানোয়ার একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে! সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নামছে, দেখলাম। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিনগুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিট অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ঐ অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেলো না। পড়ি-মরি প্রাণপণ ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেওয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মতো আমরা উঠে গেলাম। শরীরে

আর এতোটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

ওপরে উঠেই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

সব সইতে পারি বুঝলি, শুধু ঐ গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখুনি মুচ্ছো গেলাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি সেজমামা আমার মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, 'বাপ, বেঁচে আছিস তা হলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল্ একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।'

সেজমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম, কুণাল মিত্তিরদের টিলার নিচেই এসে পড়েছি। সেজমামা গাড়ি আনতেই বললাম, 'কী আশ্চর্য, না সেজমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম আবার ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।'

সেজমামা বললেন, 'আশ্চর্য বইকি। আমরা যে বেঁচে আছি সেটা আরো আশ্চর্য!'

তাই তো, যন্ত্রটা চাঁদেই পড়ে আছে। পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজমামা বললেন, 'আবার কী?'

'কেন, সব লিখে রাখতে হবে না? ওখানে ঠাণ্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে—।'

সেজমামা বললেন, 'সে আমি মনোহরকে বলে দেব'খন। আর দেখ, এসব কথা খবরদার বাড়িতে বলবি নে।'

বাবা-মা'রা আমাদের দেখে অবাক।—'এ কী, কাল গেলে আজই ফিরে এলে?'

সেজমামা বললেন, 'সেখানে মহামারী লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।' এদিকে আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কি!

ছোটকাকা থামলে আমরা বললাম, 'তবে কেন বললে, একরকম বলতে গেলে চাঁদে গিছলে?' ছোটকাকা বললেন, 'তার কারণ এই ঘটনার মাস

চারেক বাদে মা হাতে করে সেজমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, 'শোনো একবার কাণ্ড। ঐ যে আমাদের কুণাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না, সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে, যেখানে কুণাল মিত্তিরের গবেষণা-গরুগুলো চরছিলো সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুণাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'গবেষণা-গরু আবার কী জিনিস?'

মা বললেন, 'ওমা, তাও জানো না? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সব রকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ঐ টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গরুগুলো ছাড়া থাকতো, ঐ বড়ি খেতো আর মন ভালো করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবোতো। বাইশ সের দুধ দিতো এক-একটা। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথা, গরুরা সব দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং! ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেলো। শুনলে একবার!'

আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাগদের মারতে লাগলাম।

'হ্যাঁরে, তোরা এখনো বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না? এই বলে ছোটকাকা আবার পা মেলে দিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

পেয়ারা গাছের নিচে

বুড়ো দাদু আর মনুয়া দিনভর পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকে। শীত এসে যায়, পেয়ারা গাছের পাতা বড়ো কম, ডালের মাঝখান দিয়ে রোদ এসে ওদের গায়ে পড়ে, ডালপালার আঁকাবাঁকা ছায়া ওদের গায়ে পড়ে। সেই ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওপর দিকে চেয়ে মনুয়া দেখে আকাশের নীল গায়েও ঐরকম ডালপালা সাদা রং দিয়ে আঁকা।

বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে…

মনুয়া একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বুড়ো দাদু, কাল আমার জন্মদিন, আমার বন্ধু কাঁকরের তাই নেমন্তন্ন।'

বুড়ো দাদু নীল আকাশ যেখানে নীল বনের পেছনে ডুবে গেছে সেদিকে চেয়ে বলেন, 'কাল আমারও জন্মদিন, আমার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে।'

মনুয়া বলে, 'কারা তোমার বন্ধু, বুড়ো দাদু ? তাদের চিঠি দিতে হবে না ? মা কাল কিসমিস দিয়ে পায়েস রাঁধবে।'

বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে, কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন, 'কি জানি, তাদের নাম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যে কোপাই নদীতে চান করতে যেতাম, তাদের না বললে যে তারা মনে দুঃখ পাবে।'

মনুয়া উঠে এসে বলে, 'দাও তো দেখি তোমার হাতবাক্স, আমি খুঁজে দেখি তাদের নাম ঠিকানা পাই কি না।'

কিন্তু বুড়ো দাদু কিছুতেই বাক্স দেবেন না। বলেন, 'নারে মনুয়া, তোর বাবাকে, নাকি তার বাবাকে কাকে যেন একবার দিয়েছিলাম, সে ঘেঁটেঘুঁটে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছিলো। পরে রসিদ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তুই বরং অন্য কোথাও খুঁজে দেখিস।'

'তা হলে মাকে ক'জনার জন্যে পায়েস রাঁধতে বলবো, বুড়ো দাদু ?'

বল্‌ গে পাঁচজনার জন্যে।—নারে, দাঁড়া দাঁড়া, যে আমার নতুন চটি কোপাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো তাকে বলে কাজ নেই। তার নষ্টামির আর শেষ নেই। কি জানি তোদের এসব ফুলগাছটাছ যদি ছিঁড়ে মাড়িয়ে একাকার করে। ওকে বাদ দিলেই ভালো।'

'বেশ, তা হলে বলি চারজন ?'

'না রে দাঁড়া, দাঁড়া। ঐ যার কটা চোখ, সে ভারি ঝগড়ুটি রে মনুয়া। শেষটা যদি তোর বন্ধু কাঁকরের সঙ্গে মারপিট করে ? ওকেও না বলাই ভালো।'

'তবে কি তিনজনকে বলা হবে, বুড়ো দাদু ?'

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বলেন, 'তিনজন আবার কোথায় পেলি মনুয়া ? গয়লাবাড়ির ওপারে যে থাকে, গয়লাদের কাছ থেকে চুরি করে সর মাখন খেয়ে খেয়ে, তার যে শরীরের আর কিছু নেই। অতো পায়েস তার সইবে কেন ? ওর নামটাও কেটে দে।'

মনুয়া বললো, 'তা হলে আমার বন্ধু কাঁকর আর কাঁকরের ছোট ভাই উদো আসবে। আর তোমার বন্ধু দু'জন তো? যাই মাকে বলে আসি গে।'

বুড়ো দাদু তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'কি জ্বালা! অতো তাড়াটা তোর কিসের শুনি? ঐ দু'জনের একজনের মুখে সারাক্ষণ মন্দ কথা লেগেই আছে, সে-সব শুনে যদি তোরা শিখে ফেলিস? থাক, ওকে না বলাই ভালো।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর কাছ ঘেঁষে এসে বলে, 'তবে কি মোটে একজনকে বলবো?'

বুড়ো দাদু, এদিকে ওদিকে বাগানের চারদিকে, দূরে পাকড়াশিদের বাঁশ ঝাড়ের দিকে আমতালির পথের দিকে চেয়ে বলেন, 'আবার একজন কোথায় পেলি রে মনুয়া? আমাকে সুদ্ধু নিয়ে বলেছিলাম পাঁচজন।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, 'তবে কি তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না?'

বুড়ো দাদু শুনে অবাক হন।

'কেউ আসবে না কিরে? ওরা ক'জনাই শুধু আসবে না, আর তো সবাই থাকবে। কাঁকর, কাঁকরের ভাই উদো, তুই, তোর মা, বাবা, কাকা, পিসি, তাদের বাবা ভুলো। ভুলোকে ভুলিস নে যেন, নেড়িকুত্তো হলে কি হবে, কি গায়ের জোর ভুলোর। ও হয় তো একটু বেশিই খাবে। কিন্তু—'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'কিন্তু কি বুড়ো দাদু?'

'আমি তোকে কি দেবো? দে তো দেখি আমার হাতবাক্সটা।'

বল কি চাস? গয়না চাস?

'গয়না তুমি কোথায় পাবে বুড়ো দাদু?'

'কেন? আমার ঠাকুরমার কতো গয়না ছিলো! ডাকাতের সর্দার ছিলো আমার ঠাকুমার বাবা। তার ভয়ে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সন্ধ্যের পর ভয়ে কেউ পথে বেরোতো না। বেরোলেই তাদের মেরে কেটে, গয়নাগাঁটি যা ছিলো কেড়েকুড়ে—ওকি মনুয়া, মুখ ঢাকছিস কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, গয়নাগাঁটি না-ই নিলি। তাছাড়া সে সব নেইও। মোহর নিবি? থোলো থোলো সোনার মোহর? একটাও ডাকাতি করে পাওয়া নয়। রাজা ছিলো রে আমার ঠাকুরদা। ওদের বাড়িতে সবাই দুধে চান করতো, সোনার খাটে বসে রূপোর খাটে পা

রাখতো, তকমা-পরা দাস দাসীরা সোনাবাঁধানো চামর দোলাতো।'

মনুয়া বললো, 'কোথায় পেতো থোলো থোলো সোনার মোহর ওরা ?'

বুড়ো দাদু হেসে বললেন, 'ওমা তাও জানিস নে বুঝি ? প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হতো যে, না দিয়ে সব যাবে কোথা। ধান কেটে, ঘর জ্বালিয়ে—'

'ও কি মনুয়া, কাঁদছিস নাকি ? আচ্ছা, মোহর না-ই নিলি, সে সব হয়তো খরচও হয়ে গেছে এদ্দিনে। তুই বরং এই মোটা কাচের কাগজ চাপাটা নে।' বুড়ো দাদু মোটা কাচের কাগজ চাপা উঁচু করে তুলে ধরেন। বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে মাদুরে শুয়ে মনুয়া সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘন নীল আকাশ দেখতে পায়। কাচের ওপর রোদ পড়ে; ধার দিয়ে রামধনুর রং ছিটোয়। রামধনুর রং এসে বুড়ো দাদুর গায়ে, মনুয়ার গায়ে বেগুনি, নীল, কমলা, লাল রঙের আঁকিবুঁকি কাটে। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। পেয়ারা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার ছায়া ওদের গায়ে এসে পড়ে।

মা এসে বাটি করে ওদের জন্যে গরম দুধ, পাঁউরুটি আর নরম নরম লাল চিনি দিয়ে যান। বলেন, 'ও মনুয়া, কাল তোর জন্মদিনে কাঁকরদের নেমন্তন্ন করে আসিস।'

মনুয়া বলে, 'কাল বুড়ো দাদুরও জন্মদিন। বুড়ো দাদুও কাঁকরদের নেমন্তন্ন করবে।'

নোকোসি

সেজদাদু চেয়ারের উপরে পা গুটিয়ে বসে বললেন—'নেই বললেই নেই ? যেই তোরা দরজা ভেজিয়ে নিচে চলে যাবি অমনি সে ম্যাও ম্যাও করতে করতে কিছুর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে গা না ঘষে তো কি বলেছি। ভালো করে খুঁজে দ্যাখ, সে তো আর কর্পূর নয় যে উবে যাবে। বাবা! খায় কম ? আমার দেড়া গেলে অথচ দেখতে তো এঁটুকু।

মিনু ফোঁচ ফোঁচ করে খানিকটা কেঁদে নিয়ে বলল—'খালি খালি পুষুমণিকে চোখ দিও না বলছি, খায় তো চাট্টিখানিক পাতকুড়ুনি, শোয়

নোকোসি

ছাই-এর গাদায়, ও বেচারির উপরে তোমার অত রাগ কেন শুনি?'

ট্যাঙস বললে—'রাগ নয়, স্রেফ ভয়। বেড়াল দেখলে বুড়োর চুল দাড়ি খাড়া হয়ে ওঠে।'

আমাদের পুরনো চাকর ভজুদা সেজদাদুর সঙ্গে নাকি খেলা করত, সে খাটের তলাটা ঝাঁটা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললে—'ভারি ভীতু, সেজদাদাবাবু।'

সেজদাদু শুনে চটে কাঁই।

'হতে পারি তোদের কাছে ভীতু, কিন্তু যে দিন নোকোসির লুকানো ঐশ্বর্য উদ্ধার করতে নেমেছিলাম সেদিন কেউ আমাকে ভীতু বলেনি। দুনিয়ারি এই দস্তুর, আজ যাকে বীরত্বের জন্যে লাটবাহাদুর সনদ্ দেয়, কাল তাকে নিয়ে নাতিনাতনিরা হাসাহাসি করে—ঈ-ঈ-ক্।'

অমনি আমরা হুড়মুড় করে তাঁকে ঘিরে ফেললাম—'কি হল? কি হল, সেজদাদু? ওরকম করছ কেন, নোকোসির ঐশ্বর্যের কথা বলবে না?'

মিনু নাকি-সুরে বললে—'সব চালাকি। বেড়াল নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু গল্প না বলার ফন্দি।'

সেজদাদু ঢোক গিলে চেয়ারের হাতলে চড়ে বসে বললেন—'বেড়াল নেই তো কে আমার বনুইএ সুড়সুড়ি দিল?'

ট্যাঙস বললে—'আমি গো, আমি। ইচ্ছে করে দিইনি, ভালো করে গল্প শুনব বলে এগিয়ে যেতে গিয়ে, ঐখেনে মুণ্ডুটা একটু ঘষে গিয়েছিল।'

ঠিক এমনি সময় ম্যাও!—বলে এক বিকট চিৎকার করে হলদে বিদ্যুতের ঝলকের মতো পুষুমণি বই-এর আলমারির মাথা থেকে এক লাফে নেমেই দে ছুট।

শোঁ-ও-ও করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চোখের পলক না ফেলতে একতলার উঠোনে ভজুদার বৌ যেখানে মাছ কুটতে বসছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ওখান থেকে যে সহজে নড়বে না সেটা জানা কথা।

দরজা ভেজিয়ে সেজদাদুকে ঘিরে বসা হল—'বল শিগ্‌গির, নইলে আবার ডেকে আনব।' সেজদাদু এবটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন—'ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে পুরনো কমিনোর আপিসে গেছিস্ কখনো? আশ্চর্য সে জায়গা, মিনে করা মেজে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি গালিচে পাতা, একতলা থেকে তিনতলা অবধি পেতলের থাম, তার মাথায় লাল রঙ ছাই রঙ সোনালি রঙ দিয়ে সে যে কি চমৎকার নকসা করা। থামের গায়ে চূণকাম করা বটে কিন্তু হঠাৎ যদি আচমকা কেউ একটা কাগজ চাপা দিয়ে ঠুং করে মারে অমনি মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ওটা ছিল এককালে সিরাজউদ্দৌলার নাচঘর। একদিকের দেয়ালে সারি সারি প্রকাণ্ড আয়না ঝুলছে, এককালে সে আয়নাতে নবাব বেগম সাহেব বিবিদের ছায়া পড়ত।'

এই অবধি বলে গল্প থামিয়ে সেজদাদু কেমন যেন শিউরে উঠলেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে খাটের তলায়, বই-এর আলমারির কোণায় দেখে নিলাম, কোথাও কিচ্ছু নেই।

ট্যাঙস বললে—'সবটাতে তোমার ইয়ে, বেড়াল নেই তো আবার ভয় টয় কিসের ?'

সেজদাদু বললেন—'ভয় ? না ঠিক ভয় নয়, তবে পাঁচটার পর আর ঐ হল ঘরটাতে কেউ থাকতে চাইত না। কোনো রকমে কাজকর্ম শেষ করে, গাছের ছায়া লম্বা হয়ে আসবার আগেই সবাই কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে কেটে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটিও কেমন অন্য রকম হয়ে যেত। বাইরের রাস্তার হাজার গাড়ির ঘড়ঘড়ানি আর শোনা যেত না।'

'হলঘরের পিছনে কাঠের সিঁড়ি, সেকালের মেহগিনি কাঠ, পেকে একেবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে, তার গায়ে একটি পেরেক ঠোকা দায়। পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে দল বেঁধে ঝাড়গ্রাম যাওয়া হবে। পানু—আমার ভাগ্নে পানুকে জানিস তো ; সেখানে এখন থেকেই মুর্গি জমা করছে, অথচ কাজ শেষ করে দিতে না পারলে আমার যাবার যো নেই। আমাদের বড় সাহেব তো মানুষ ছিল না, স্রেফ একটি কালো চিতা-বাঘ, তেমনি নিঃশব্দ, তেমনি হাল্কা, তেমনি কালো, তেমনি গনগনে হলুদ চোখ। উঃফ্! নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালে গলায় যেই একটু গরম নিঃশ্বাস পড়েছে আর অমনি আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়েছে। 'ট্যাঙস বললে—আহা, আমার তো একটা ম্যাও শুনলেই হাতে পায়ে খিল ধরে !' সেজ-দাদু চটে মটে উঠে যান আর কি ? সবাই মিলে গাঁট্টা মেরে ট্যাঙসকে থামানো হল। সেজদাদু বললেন—'তাই রোজই একটু করে দেরি হয়ে যেতে লাগল। সবাই চলে যায়, আমি একে সাধি ওকে সাধি, পান খাওয়াই, পকেটে করে ভেজিটেবল চপ নিয়ে যাই, একটু যদি কেউ থেকে যায়। এমনিতেই আলো জ্বালাবার পর থেকেই গা ছমছম করতে থাকে ; এতটুকু শব্দ হতেই ঘরময় প্রতিধ্বনি ওঠে, সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার সে তোরা ভাবতে পারিস নে।'

'বড় সাহেবের পেয়ারের কেরানি নোকোসি কোন দিশী লোক তা কেউ জানে না। গায়ের রঙ তামাটে, হলুদ বাঁকা চোখ, খাঁদা নাক, পাতলা গরগরে শরীর, সাদা খাটো সার্ট পেন্টলুন আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো পরে আর অষ্ট-প্রহর ফস্ ফস্ করে বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে কান ভাঙানি দেয়। কবে টিফিনের সময় কে কি বলেছে, কে কোথায় কি গোঁজামিল দিয়েছে, সব গিয়ে লাগাব। ফলে এর ছুটি কাটা যায়, ওর প্রমোশন বন্ধ হয়। বুঝতেই তো পাচ্ছিস আপিসসুদ্ধ লোক ওর উপর কি রকম হাড়ে চটা ছিল। আমি বেশি ঘাঁটাতাম না, গড় গড় ইংরিজি বলত, কিন্তু পান খেতে খুব ভালোবাসত। মাঝে মাঝে বড় এক খিলি পান ওর হাতে গুঁজে দিয়ে খুশি রাখবার চেষ্টা করতাম ছুটিছাটার ব্যাপারে ওর যেরকম প্রতাপ।'

'তা ঐ যা বলছিলাম মহালয়ার আগের দিন অবধি ফাইলের গন্ধমাদন নিয়ে পড়েছিলাম, সেদিন যত রাত্তির হক আর যা থাকে কপালে বলে তাল ঠুকে লেগে গেলাম। কোনো দিকে হুঁস নেই, কাজ শেষ করতে রাত দশটা। চৌকিদারকে বলা আছে, সেও কি সহজে ভিতরে আসে, ঠায় বাইরে বসে রইল, আমি বেরুলে বাইরে থেকে তালা দেবে। থামের পিছনে নির্জন

কোণে নিজের জায়গাটিতে কাজ সেরে যেই না উঠে দাঁড়িয়ে গা মোড়ামুড়ি দিতে যাচ্ছি, সামনে তাকিয়ে গায়ের রক্ত হিম। দোতলার উঁচু গ্যালারির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মিশ-কালো কি একটা নেমে আসছে।'

'কি আর বলব তোদের, আঁৎকে উঠে নিজের জিভটাই আরেকটু হলে গিলে ফেলছিলাম। কান বোঁ বোঁ, মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা কিছু আর বাকি রইল না। মিশ-কালো চাপা গলায় এক ধমক দিয়ে বলল ওকি হচ্ছে চ্যাটার্জি, পা ল্যাগব্যাগ করছ কেন? এত রাত্রে এখানে কি হচ্ছেটা শুনি?'

'জ্যান্ত মানুষের গলা শুনে ধড়ে আমার প্রাণ ফিরে এল। বললাম, এই এতক্ষণে কাজ শেষ হল, কাল থেকে তেরো দিনের ছুটি শুরু, বাহবা কি মজা! কিন্তু তুমি এত রাত্তিরে কি মনে করে?'

বুঝতেই পাচ্ছিস ততক্ষণে তাকে আমার চিনতে বাকি নেই। সে নোকোসি। নোকোসি কাঠের সিঁড়ির একটা ধুলো ভরা ধাপে বসে পড়ে বললে—আমার সর্বনাশ হতে চলেছে।'

সে এমনি একটা হতাশকণ্ঠে বলল আর চারদিক থেকে তার ফিস ফিস কথার এমনি একটা খসখস মরমর প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল যে আমি ভয়ে কাঠ! নোকোসি বললে, বোস চ্যাটার্জি, আমার পাশে এইখানটিতে বস। সত্যি কথা বল, কখনো কি তোমার মনে হয় নি যে আমার মতো একটা লোক তোমাদের মতো সাধারণ লোকদের সঙ্গে এত মাথা-মাখি করি কেন, এই রকম একটা বাজে আপিসের থার্ড ক্লাস বড় সাহেবের দিন রাত খোসামুদি করি কেন?'

বললাম—'সে আশ্চর্যটা কি, মাইনে বাড়াবার জন্যেই ওরকম কর।'

'সেই অন্ধকার ভুতুড়ে ঘরে নোকোসি চাপা গলায় অট্টহাস্য করে উঠল আর চারদিকের অন্ধকার থেকে তার যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল সে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজের অজান্তে ওর কাছ থেকে খানিকটা সরে বসলাম।'

'নোকোসি বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতের কব্জি ধরে বলল, আজ ভগবান তোমাকে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আজ আর তোমাকে ছাড়া নয়। কি বলব তোদের হাত-পা আমার পেটের ভেতর সিঁদিয়ে গেল; এর চেয়ে ভূত দেখা দিলে আর কি খারাপ হত? এখুনি হয়ত কোমরবন্ধ থেকে সরু লিকলিকে ছোরা বেরুবে।'

'কিন্তু নোকোসি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, পকেট থেকে ময়লা একটা কাগজের টুকরো বের করে আমাকে বললে, এই দলিলটা কোথায় বল।'

'দেখলাম তাতে দলিলের নম্বর লেখা রয়েছে এ ৫৫৭/কিউ ১১/সি ডি ৩। বললাম, এ তো খুব শক্ত নয়, ও তো এ সেক্সনের ৫৫৭ সংখ্যার সন্দেহ-জনক বিষয় সংক্রান্ত এগারো নম্বরের কনফিডেন্সেল ডকুমেন্ট তিন নম্বর। আজ কদিন ধরে তো ঐ সেক্সনেরি নম্বর মিলিয়ে আজ এইমাত্র শেষ করলাম। চল, উঠি। চৌকিদার তালা দেবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'নোকোসিকে সাবধান করে দেবার জন্যেই শেষ কথাগুলো বললাম। চৌকিদার অপেক্ষা করছে না হাতি ! ছাপর খাটে শুয়ে ঠেসে ঘুম লাগাচ্ছে, ঠ্যাং ধরে না ঝাঁকালে জাগবে না। নোকোসির চোখ দু-টো অস্বাভাবিক রকমের জ্বলজ্বল করে উঠল। পকেট থেকে ভোঁতা একটা রিভলভার বের করে বলল—। 'ওকি ট্যাঙস, পড়ে গেলি যে ?'

ট্যাঙস উঠে বলল—'কেমন গা শিরশির কচ্ছিল বলে হাত ফসকে গেল।'

'থামছ কেন, নাও নাও, বল ; এই কি থামবার সময় নাকি ?' সেজদাদু বলতে লাগলেন—

'দাঁতে দাঁত চেপে নোকোসি বললে, এতে সাইলেন্সার লাগান আছে, একবার ঘোড়া টিপলে বাছাধনকে আর ভাবতে হবে না। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ, টুঁ শব্দটি হবে না। শোন, ওই দলিল আমার চাই, আমি এইজন্যেই এত রাত অবধি অপেক্ষা করে আছি, বাড়িতে গিন্নি মাংস ভাত রেঁধে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, আর মেজাজ খারাপ করছেন, তবু বসে আছি। তার একমাত্র কারণ আমি বড়সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি, তুমি এই সেক্সনে কাজ করবে অনেক রাত অবধি, চাবি তোমার কাছে থাকবে আন্দাজ করলাম। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি এক থাপ্পড়ে চাবি কেড়ে নিতে পারি, কিন্তু চাবি পেলেও দলিল খুঁজে বের করা আমার কর্ম্ম নয়। ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা, বল !'

'বলে নোকোসি খপ করে আমার ঘাড় চেপে ধরল। ঠিক ওইখানেই আমার বাতের ব্যথা, বেজায় লাগল। দারুণ রেগে হাত ঝেড়ে ফেলে বললাম, যদি না দিই, আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে এই তো ? তা মার না গুলি, আমি ভয় পাই না !'

'তাই শুনে নোকোসি একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার পা ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা কর ভাই, মনের দুঃখে কাকে কি বলেছি, ঠিক নেই ! তোমাকে কি আমি মারতে পারি, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তাছাড়া ওটা খেলবার বন্দুক, মারলেও তোমার কিছু হবে না, কিন্তু দলিলটা না পেলে আমাদের সর্বনাশ হবে।'

বললাম—'কেন ?'

'নোকোসি বললে, সে আর বল না ভাই, ওতে আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্নের গুপ্তস্থানের রহস্য সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা রয়েছে। নেবও না আমি, শুধু খানিকটা টুকে নেব। এতে তোমার কি আপত্তি থাকতে পারে, ভাই ! বাড়িতে মা-বৌ খেতে পাচ্ছে না, ছেলেটার মুখে ওষুধ দিতে পাচ্ছিনা—'

বললাম—'এই না বললে, মাংস-ভাত রেঁধে বসে বসে রাগ-মাগ' কচ্ছেন ?'

'সব ধাপ্পা রে ভাই, দুঃখে-কষ্টে কি আর আমার মাথার কিছু ঠিক আছে ? এককালে এই বাড়িতেই আমার পূর্বপুরুষরা নেমন্তন্ন খেতে আসতেন, এই ঘরে নাচতেন, এই আয়নায় তাঁদের ছায়া পড়ত, এখনও যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—ও কি, উঠছ যে, সত্যি দেবে নাকি ?'

নোকোসি

'একগাল হেসে তড়াক করে নোকোসি লাফিয়ে উঠল। বুঝলি কিনা, ভয়কে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্ট সইতে পারি না। একটু টুকে নেবে বইতো নয়।'

'চাবি হাতে সটাং গেলাম ফাইলের তাকের পিছনে লোহার সিন্দুকের কাছে! পায়ে পায়ে নোকোসিও চলেছে, কানের উপর তার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, তার বুকের ধড়াস ধড়াস শুনতে পাচ্ছি, অবিশ্যি সেটা আমার বুকেরো হতে পারে।'

'অন্ধকার নির্জন জায়গাটা, অন্ধকার আলমারির মাঝের গলি। এইতো সেই লকার। এরি মধ্যে না—চাবি সুদ্ধ হাত তুলেছি, এমনি সময় আলমারির মাথায় দু-টো গন্‌গনে চোখ জ্বলে উঠল! আর কি আমার জ্ঞান থাকে, এই বুঝি ম্যাও বলে লাফ দিল! বিকট একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার দিয়েই একেবারে হাত পা ছুঁড়ে মুচ্ছো!'

'সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে তাল তাল ফাইল পড়ল। চৌকিদাররা চার পাঁচ জন খইনি খাচ্ছিল, মোটা মোটা লাঠি টর্চ নিয়ে তারা ছুটে এসে নোকোসিকে পাকড়াও করল।'

সেজ দাদু থামলেন। ট্যাঙস বলল—'আঃ! বলনা তারপর কি হল।'

'তারপর আবার কি হবে? নোকোসির চাকরি গেল।'

'বাঃ, জেলে গেল না?'

'জেলে যাবে কেন। কিছু তো নেয় নি বেচারি। আমিও বুদ্ধি করে চেপে গেলাম। বড়সাহেব বললেন অসাধারণ সাহস দেখিয়ে লকার রক্ষা করেছি। নোকোসির পকেটে নাকি কোন বড় মামলার সাক্ষী দলিলের নম্বর টোকা ছিল। আর চৌকিদার বলল—বজ্জাৎ বিল্লি এইখানে লুকিয়েছিল আর আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!'

একটু চুপ করে থেকে সেজদাদু বললেন—'সেই আমাকে তোরা আজ কাল ভীতু বলিস—ঈ-ঈ-ক্! ও ট্যাঙস, ও ভেদা, ও ন্যাড়া আমার পায়ে কি ঘষে গেল রে নরম গরম।'

এই বলে সেজদাদু চেয়ারের উপরে পা তুলে নিলেন।

ট্যাঙস তবু বললে—'ওসব রাখো এখন। বল শিগ্‌গির লাটসাহেব তোমকে কবে সনদ দিল!'

সেজদাদু এক চোখ খাটের নিচে আর এক চোখ আলমারির মাথায় রেখে বললেন—'আহা, আমাকেই দিয়েছিল তো আর বলি নি, তবে ওরকম একটা দুঃসাহসিক কীর্তির পর সনদ দিলেও কিছু আশ্চর্য হবার ছিল না—দরজার পেছনে ওটা কিসের ল্যাজ না?'

গুণুপণ্ডিতের গুণপনা

আমার পিসিমা ভীষণ ভাল হলেও বেজায় ভীতু। সব জিনিসে তাঁর ভয়। যেখানে যা আছে তাতো ভয় আছেই, আবার অনেক জিনিস নেই তাকেও ভয়। বড়দিনের ছুটিতে একবার গেছি তাঁর বাড়িতে। মফঃস্বল শহর। খাবার-দাবারের ভারি সুবিধা। হপ্তায়, হপ্তায় ধোপা আসে,

কুড়ি টাকা মাইনেতে এক্সপার্ট চাকর পাওয়া যায়। বাড়ির সামনে এবং পিছনে নিজেদের বাগান, দু'পাশে পাশের বাড়িগুলোর বাগান; সামনে ডাক্তারের বাড়ি। মোড়ের মাথায় সিনেমা। খেলার মাঠে প্রতি বছর এই সময় গ্রেট সরোজিনী সার্কাসের তাঁবু। তাছাড়া ওখানকার প্যাঁড়া আর ক্ষীরের পান্তুয়া বিখ্যাত। আর এন্তার মুর্গি পাওয়া যায়। এমন জায়গা ঝপ্ করে বড় একটা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আগেই ট্রেন থেকে নেমেছি। শির্‌শির করে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। ঠং ঠং করে কোথায় একটা কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরাচ্ছে। লোকের বাড়িতে উনুনের আঁচ পড়ছে। পিসিমার গেটের ওপরে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। সেদিন রাত্রে যখন বড় খাটের পাশে আমার ছোট নেওয়ারের খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম, তখন খালি মনে হচ্ছিল দশ দিনের বদলে যদি একশো দিন থাকতাম কি মজাটাই না হোত!

কিন্তু সেকেলের কোন এক ঋষি যে কথা ভূর্জপাতার খাতায় খাগের কলমে লিখে গেছেন যে এ পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না, সেটা ঠিক। পরদিন ভোরে পিসিমার সঙ্গে নিচে নেমেছি। পিছনের বারান্দার জালের দরজার ছিটকিনি খুলে গয়লানীর কাছে আমার জন্যে বেশি করে দুধ নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় গয়লানী বললে, 'তালার ব্যবস্থা করুন মা। জালের ফোকর দিয়ে হাত গলিয়ে এ দরজাটা খুলে ফেলতে দুষ্ট লোকের কতটুকু সময় লাগবে!'

পিসিমা বললেন—'কি যে বলিস বাতাসি, শুনলেও হাত-পা কাঁপে।' বাতাসি বললে—'না, বালানগড়ের জেলখানা থেকে গুণুপণ্ডিত পালিয়েছে কিনা তাই বলছিলাম।'

গুণুপণ্ডিতের নাম শুনেই পিসিমার বুক কেঁপে উঠলো তবু জোর করে হেসে বললেন—'হ্যাঁ, তুই ও যেমন, কি আর এমন সোনাদানা আছে আমার ঘরে যে জেলভাঙা ডাকাত ধরা পড়বার ভয় ভুলে, আমার বারান্দার ছিটকিনি নামাবে?'

দুধের ক্যানাস্তারা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল বাতাসি। আমার দিকে তাকিয়ে এতটা গলা নামিয়ে যাতে স্পষ্ট আমি শুনতে পাই, বললে—'আহা সোনাদানা নয়, ওনাদের দল আছে, তারা ছেলেধরা করে নিয়ে যায়। তারপর বেনামি চিঠি দেয় সুঁদরিবনের কালী-মন্দিরের পেছনে

বটতলাতে হাজার টাকা পুঁতে এসো তবে ভাইপো ফিরিয়ে দেব। না দিলে—' এই বলে বাতাসি এমনভাবে চুপ করল যে পিসিমা কেন, আমারি গা শিউরে উঠল।

বারান্দার কোণায় কাঠের টেবিলে বড় স্টোভে পিসিমার বুড়ো চাকর হরিন্দম চায়ের জল ফুটোচ্ছিল, সে এবারে বেরিয়ে এসে বললে—'আর ভয় দেখাবার জায়গা পাসনি বাতাসি? ও ছেলেকে কেউ নিয়ে গেলে ফেরৎ দেবার জন্য পয়সা চাইবে না, বরং পয়সা দিয়ে ফেরৎ দেবে।'

বাবা বলেন, 'হরিন্দম বলে নাম হয়না অরিন্দম হবে।' মনে হতেই বললাম কথাটা। শুনে হরিন্দমের কি রাগ! বললে—'হ্যাঁ, আমার বাবা নাম রাখল হরিন্দম আর ওনার বাবা তার চেয়ে বেশি জানেন! তাও যদি তাকে দাদামশায়ের কাছে কানমলা খেতে না দেখতাম!'

পিসিমা রেগে গেলেন—'ওসব কি শেখাচ্ছ বাপকে অশ্রদ্ধা করতে, হরিন্দম?'

হরিন্দম বললে—'হরি মানে ভগবান, তা ভগবানের নাম এনাদের সব আজকাল ভাল লাগবে কেন? অরিন্দম আবার একটা নাম হল?'

বাতাসি হেসে দুধের ক্যানেস্তারা নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে বলল—'দুধ নেবার সময় দারোগাবাবুর মা বললেন, 'গুণুপণ্ডিত এদিক-কার ছেলে নয়, কড়িগাছায় ওদের সাত পুরুষের বাস। সেখানেই পুলিস আগে যাবে গো মা, কাজেই সেদিকে না গিয়ে আগে এদিকেই তার আসা! পরে গোলমাল চুকে গেলে পর এই তিন কোশ পথ পেরিয়ে গুটি গুটি হয়তো মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে। এ আমার দারোগাবাবুর মা-র মুখ থেকে শোনা-মা, তাই বলে গেলাম।'

বাতাসি গেলে পর রুটি টোস্ট, ডিমভাজা, চিনি দিয়ে কালকের দুধের সর, এই সব আমাকে দিতে দিতে হরিন্দম আমাকে বললে—'বাতাসির যেমন কথা! তালা-চাবিতে গুণুপণ্ডিতের কি করবে! মস্ত বড় পণ্ডিত সে, নানা রকম মন্ত্র জানে, কি একটু পড়ে দেবে, তালা আপনা থেকে খুলে যাবে।'

পিসিমা চটে গিয়ে বললেন—'পণ্ডিত না আরও কিছু, ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডা বল।'

ঠিক এই সময় পিসেমশাইও নেমে এসে চায়ের টেবিলে বসে বললেন—

এ আমার দারোগাবাবুর মা-র মুখ থেকে শোনা

গুণুপাণ্ডিতের গুণপনা

'কে ঠ্যাঙ্গাড়ে গুণ্ডা ?'

পিসিমা তাকে খাবার দিতে দিতে বললেন—'গুণুপণ্ডিত নাকি কয়েদ ভেঙ্গে ফেরারী হয়েছে। বাতাসি বলছিল এমুখো হবার সম্ভাবনা, দারোগার মা নাকি বলেছে।'

ডিম খেলে পিসেমশাইর হেঁচকি ওঠে, তাই সকালে পাঁউরুটি সাদা মাখন দিয়ে জেলি দিয়ে খান। তাতে এই বড় একটা কামড় দিয়ে বললেন—'একেবারে বাঘা ডাকাত ঐ গুণুপণ্ডিত, বুঝলি গুপ্নি। প্রাণে এতটুকু ভয়ডর নেই, যা করবে ঠিক করেছে তা করবেই, মেরে-ধরে ঠেঙিয়ে, বোকা বানিয়ে যেমন করে হোক। ভাবতে পারিস সরকারী গুদোম থেকে পাঁচ হাজার মণ ধান একসারি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। বলল নাকি দিল্লী থেকে হুকুম হয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে বিলি হবে। সাতদিন বাদে খোঁজ হলো। তাও ধরা পড়ত না, শুধু চৌকিদারটাকে দেরি করে তালা খোলার জন্যে টেনে এক চড় কষিয়েছিল, সেই রেগে মেগে ধরিয়ে দিলে। একটা মুখোস পর্যন্ত পরে আসেনি এমনি সাহস।'

পিসিমা চায়ের পেয়ালায় ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন—'বাঃ তুমি দেখছি গুণুপণ্ডিতের ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছ! তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

সামনের বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুর ভাই শৈলবাবু মাঝে মাঝে গল্প করতে আসেন। তিনি নাকি ছোটবেলায় একবার খুব বাতে ভুগেছিলেন বলে কাজকর্ম সে-রকম করতে পারেন না, পিসিমা বলেন। শৈলবাবু বললেন—'সাংঘাতিক লোকটা, একটা কিছু করার ঠিক করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। সে নাকি অনেক রকম ভেল্কি জানে। কার যেন বন্ধ সিন্দুক থেকে হীরের আংটি বের করে নিয়েছিল সিন্দুক না খুলেই। খুব সাবধানে থাকবেন বৌদি।'

মাছ বিক্রি করতে ঘনশ্যাম এল। সেও বললে—'বাবা! সাবধানের মার নেই, ছেলেপুলে নিয়ে রয়েছেন মা!' পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন—'পুলিস দারোগা ডিটেক্টিভ সবাই লেগেছে, আজ সন্ধ্যের আগেই তাকে ধরে ফেলবে দেখিস। কেন মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বল দিকিনি?'

ঘনশ্যাম বললে—'ধরা কি অতই সহজ মা? থানে থানে নাকি তার আস্তানা আছে। এক এক জায়গায় এক এক নাম, এক এক চেহারা।

তুড়ি মারতেই ভোল বদলে ফেলে, এই একরকম দেখছেন, এই দেখবেন অন্যরূপ! লোকে বলে এমনিতে হয় না, তুক করে।'

বেলা যতই বাড়তে থাকে সবার মুখে ঐ এক কথাই ফেরে—'গুণুপণ্ডিত জেল ভেঙেছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে সেই চৌকিদারের ধড় আর মাথা এক জায়গায় থাকতে দেবে না।' মজা হয়েছে যে চৌকিদারটাও চাকরি ছেড়ে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কেউ জানে না। সবাই বলছে তাকে খুঁজে বের না করে নাকি গুণুপণ্ডিত ছাড়বে না। এদিকেই নাকি সব জায়গায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজবে। তাছাড়া সরেজমিনে বমাল সমেত ধরা পড়েছিল, গুণুপণ্ডিতের আপাততঃ কিছু রোজগারপাতির দরকার পড়েছে। কাজেই সবাই সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল।

মাঝখান থেকে আমার ছুটিটাই না মাটি হয়। পিসিমা ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে একটু পরেই দারোগা-গিন্নির কাছে খবর সংগ্রহ করতে গেলেন। ফিরলেন সেই বেলা এগারটার পর। তখন আর আমার মাছের চপের সময় রইল না, এমনি ঝোল খেতে হল। পিসিমা দুটো বড় বড় মাছ ভাজাও আমার পাতে দিয়ে বললেন—'একা একা মোটে বেরুবে না, কেমন বাবা? সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ ডাকাত, দু-একটা ছোট ছেলেকে নিখোঁজ করে দেওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।'

শুনে আমার হয়ে গেছে, কবে থেকে কত আশা করে আছি। বললাম—'তবে কি ঘোষদের পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে যাব না?' পিসিমা ভয়ে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ও বাবা! ও কথা মুখে আনিস নে, তোকে ডুবিয়ে দিয়ে কাদার মধ্যে ছিপ পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ! কথা দে, পুকুরে যাবিনে। বিকেলে মাংসের সিঙাড়া করব।'

'ছাপাখানার বটকেষ্টবাবু তাঁর এক গেরুয়া পরা গুরু ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুপুরে খাওয়ার আগে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার বেজায় ভাব, তাঁদের দেখে পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে বললেন—'বাঃ বটকেষ্ট করমবাবা তো আমারো গুরু, ইনি তাহলে আমারো গুরু ভাই।'

বটকেষ্টবাবু ভারি চিন্তিত মুখ করে বললেন—'সেইজন্যই তো বনমালী ভাইজীবনকে তোমার কাছে আনলাম ঘেঁটু, গুরুদেবের কাজ করে বেড়ায়, যেমন যেমন জোটে তাই খেয়ে শরীরের কি হাল হয়েছে দেখছ? তাই

গুরুদেব চিঠি দিয়ে শরীর সারাবার জন্যে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। প্পোড়াকপ্পাইল্যা এদিকে আমার বাড়ি থেকে জানোই তো দশদিনের আগে তোমার বৌদির বোনেরা নড়বে না।'

আর বলতে হল না। আমার সামনেই গেরুয়া পরা ভদ্রলোকের এ বাড়িতে থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দোতলার ভাল ঘরটা তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিসিমা আর আমি নিচে নেমে এলাম। তবে একটা সুবিধেও হয়ে গেল, ভদ্রলোকের নাকি দুধ, ঘি, মুর্গি, ছানা, ডিম এই সব পথ্যি। তারমানেই পিসিমা আমাকে সমান ভাগ দেবেন।

বটকেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন—'ইয়ে, কি বলে, ঘেঁটু, বনমালী ভাইজীবন আবার একটু নার্ভাস প্রকৃতির, দরজাটরজাগুলো তোমাদের যেন বড় লটখটে মনে হয়, একটু ভেতর থেকে তালার বন্দোবস্ত করে নিলে ভালো হয়– '

আমি বললাম—'ঘনশ্যাম বলেছে তালার কম্ম নয়, সে তুক করে তালা খোলে।'

শুনে বনমালী ভাইজীবন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—'তুক-তাকে যোগ দেবার যে আমার গুরুদেবের বারণ আছে।'

বটকেষ্টবাবু হেসে উঠলেন—'আহা, তুমিও যেমন, ওসব মুখ্যুদের বাড়ান কথা। তুক না আরও কিছু, গুদোমের তালা সে কি চৌকিদারকে দিয়ে খোলায়নি বলতে চাও? সাবধানে থেকো সবাই; তবে হয়তো দেখবে কালকের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। এখানে কোন ভয় নেই।'

বনমালীবাবু ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বললেন—'মানে, ভয় পাই না ঠিক, তবে আমার ছোটবেলা থেকে বুক ধরফড়ের ব্যারাম আছে কিনা।' তাঁকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বটকেষ্টবাবু গেলেন। ঠিক হয়ে গেল বনমালীবাবু আর সিঁড়িটিড়ি ভাঙবেন না, খাবার-দাবার স্নানের জল সব দোতলায় পেঁৗছে দেওয়া হবে। বাবা! তাঁর ভয় দেখে বাঁচি না, পিসিমাকেও হার মানিয়েছেন!

দুপুরের খাওয়াটা ঠিক সেরকম জমল না। পিসিমারা ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত তা আমাকে দেখবেন কি! আর হরিন্দম বললে নাকি বেশি মাছের বড়া খেলে পেট কামড়ায়! এদিকে শীতের দুপুরে চারদিক অন্ধকার করে বেশ মেঘ জমেছে, কন্‌কনে হাওয়া বইছে। এমন দিনে কি ঘরে বসে

থাকা যায় কখনো ? ওদিকে পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে পিসিমার বারণ। অবিশ্যি স্টেশনের নতুন পুকুরের কথা তো কিছু বলেন নি। দুপুরে সবাই ঘুমুলে যেন আরো অন্ধকার করে এল, সেই সময় মাছরা সব ঘাঁই মারে। ছিপটা নিয়ে গুটি গুটি পিছনের বারান্দার তারের দরজা খুলে যেই না আতা বাগানে ঢুকেছি, দেখি আতা গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

কি আর বলব! আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। চিনিয়ে দেবার দরকার নেই, দেখলেই চেনা যায়, ছ-ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান, এতখানি বুকের ছাতি ইঁটের মতো শক্ত, পায়ের গুলিতে হাতুড়ির বাড়ি মারলেও কিছু হবে না, লাল টকটক করছে দুচোখ আর একমুখ ঘন দাড়ি, পরণে ঘোর নীল সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এর থেকে ভাল সাজ আর কি হতে পারে?

আমাকে সে আঙুল বেঁকিয়ে ডাকল। বলল—'খিদে পেয়েছে, খাবার আন্!' বললাম - 'হরিন্দম ডুলিতে তালা দিয়েছে।'

অমনি পকেট থেকে এক গোছা চাবি ফেলে দিয়ে বললে—'এই নাকি?'

দেখে আমার গায়ের রক্ত জল! ঢোক গিলে বললাম—'তবে কি হরিন্দম আর নেই?'

লোকটা তো অবাক! বলল—'কি জ্বালা, বলছি তার পেট ব্যথা হয়ে শুয়ে রয়েছে, আমি তার জ্ঞাতি ভাই, খুব ভাল রাঁধি। এখন যাও দিকিনি, ডুলিতে কি আছে আমার জন্যে বের করে আনো।'

অগত্যা তাই দিলাম, আট-দশটা মাছের বড়া পাঁউরুটি দিয়ে সে দিব্যি খেয়ে ফেলল; হয়তো সেগুলো আমারি জল খাবারের জন্য তোলা ছিল। খেয়েদেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বলল—'কি অমন করে তাকাচ্ছ কেন? খিদে পেয়েছিল, খেয়েছি তো হয়েছে কি? যাচ্ছেতাই রান্না হয়েছে বাপু। রাতে এর তিনগুণ ভাল করে রেঁধে দেবো দেখো। হরিন্দমের পেট ব্যথা, ওতো আর পারবে না। তোমার মা-বাবাকে বলে রেখো, হরিন্দমের জ্যাঠতুতো ভাই রাঁধবে।'

বললাম—'মোটেই আমার মা-বাবা নয়, পিসিমা-পিসেমশাই। তাছাড়া এই যে বললে জ্ঞাতি ভাই?' লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল—'ঐ একই হল, জ্যাঠতুতো ভাইরা বুঝি জ্ঞাতি ভাই নয়?'

তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে একবার আমাকে হরিন্দমের ঘর

থেকে ঘুরিয়ে আনল। নাক অবধি কম্বল চাপা হরিন্দম গোঁ-গোঁ করছে। দেখেই আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে! সে হরিন্দমকে বললে—'বল, মাথানেড়ে বল, আমি তোমার জ্ঞাতি ভাই, তোমার পেট ব্যথা হয়েছে তাই আমি রাঁধব।'

হরিন্দমও তার কথা মত মাথা নাড়ল।

পিসিমাকে হরিন্দমের অসুখের কথা বলে সেই ব্যবস্থাই করা গেল। সত্যি খাসা রাঁধে লোকটা, সবাই খেয়ে মহাখুসি। বনমালীবাবুর চেহারা বদলে গেল, দেখতে দেখতে ছাই রঙের মুখটাতে একটু রঙ ধরল। আহা, তাই যেন হয়, হরিন্দমের পেট ব্যথা এ দশদিনে যেন না সারে। আমরা খেয়ে বাঁচি।

লোকটা এখন নাম নিয়েছে সখারাম। দিব্যি লেগে গেল হরিন্দমের বদলে রান্নার কাজে। সেই দশদিন পিসিমার বাড়িতে যে কতরকম পরটা কাবাব কালিয়া ঝালফিরোজি ইত্যাদি চলল আর সে ক্ষীর চমচম, ঘরে তৈরি মালাই যে না খেয়েছে তাকে বলাই বৃথা।

অবিশ্যি আমি ভাল করে কিছু খেতে পারিনি, কারণ আমি জানি সখারাম হল গুণ্ডপণ্ডিত। ভেল্কি দিয়ে রান্না করে। হরিন্দমের মোটেই দশদিন ধরে পেটব্যথা হয়নি, গুণু তার মুখে গ্যাগ্ পরিয়ে, হাত-পা বেঁধে কম্বল চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে। সব জানি, কিন্তু বলি কোন্ সাহসে? এক নিমেষে সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবে না? ব্যাটার এমনি সাহস যে শেষ দিনে রেঁধে বেড়ে পিসেমশাইয়ের বন্ধুবান্ধবদের পরিবেশন করে খাওয়ালে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না, খালি বনমালী-বাবু যোগীপুরুষ, হয়তো বা মন্ত্র বলে কিছু বুঝে থাকবেন। বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখলাম। কিন্তু রান্নার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করলেন উনিই আর রোগা পটকা হলে কি হবে, খেলেনও সবচেয়ে বেশি?

খাওয়ার শেষে সবাইকে জাফ্রাণ দেওয়া ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, চার-পাঁচজন পুলিস অফিসার, কনস্টেব্‌ল্, ইত্যাদি এসে হাজির। তাদের পিছনে হরিন্দমের মুখটা দেখেই আর আমাকে বলে দিতে হল না যে সখারাম রান্নাবান্না নিয়ে আজ মশ্‌গুল, এই ফাঁকে কেমন করে দড়া-দড়ি খুলে পালিয়ে গিয়ে হরিন্দম পুলিস ডেকে এনেছে! কি ফ্যাকাশে রোগা হয়ে গেছে হরিন্দম। এবার আমাদের পোলাও কালিয়া খাওয়াও তা হলে ঘুচল।

পুলিসেরা ঘরে ঢুকতেই অবাক কাণ্ড! বনমালীবাবু একটা অস্ফুট চিৎকার করে পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় মারলেন। কিন্তু সেখানেও লোক ছিল, দেখতে দেখতে তারা তাঁর হাতে হাতকড়া পরাল। আর সখারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীর মাখা হাত দিয়েই মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

কারো মুখে প্রথম কথা সরে না। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলেই পিসেমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—'ওকি হলো দারগাবাবু, বনমালীবাবু আমার গুরু ভাই, আপনি কাকে ধরতে কাকে ধরছেন।'

দারগাবাবু বললেন—'ধরছি ঠিকই, এই রোগাপটকা লোকটিই সেই বিখ্যাত ডাকাত গুণুপণ্ডিত।'

আমি আঙুল দিয়ে সখারামকে দেখিয়ে বললাম—'আর ও তবে কে?'

এতক্ষণ পর বনমালীবাবু অর্থাৎ গুণুপণ্ডিত কথা বললেন—'ও হলো চাল গুদোমের চৌকিদার। ওর বুড়ো আঙুলের কালো আঁচিল দেখেই চিনেছিলাম, তবে এত ভাল রাঁধে বলে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তোকে বলছি শোন্।'

বলতে বলতে আমার চোখের সামনে গুণুপণ্ডিতের রোগাপটকা শরীরটা যেন দু-গুণ বড় হয়ে উঠল, গলার আওয়াজ থেকে বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সখারামের মুখ কাগজের মত সাদা, হাত-পা ঠক ঠক। গুণুপণ্ডিত বলতে লাগল—'শোন্ ভালো করে। তিনবছর বাদে আমি জেল থেকে বেরুব। বেরিয়েই যেন দেখি তুই আমার গুরুদেব করম বাবার আশ্রমে রাঁধছিস। এক্ষুণি চলে যাবি সেখানে। ঘেঁটুবাবু, দয়া করে ওর মাইনেটা চুকিয়ে দিন। তিনবছর বাদে ফিরে এসে আমি রিটায়ার করব, বাকী জীবনটা আশ্রমেই কাটাব। তুই যেন হাজির থাকিস, ভালো চাস তো!' ,

পুলিস অফিসারদের একজন একটু কেশে বললেন—'তিনবছর নয় স্যার, সম্ভবতঃ চার, জেল ভাঙগার ফল আছে তো।'

গুণুপণ্ডিত চোখ পাকিয়ে বলল—'ঐ একই, তিনেতে চারেতে তফাৎটা কি হল শুনি? মনে থাকে যেন সখারাম!'

সখারাম একগাল হেসে হাতজোড় করে বললে—'আজ্ঞে আমি এখন থেকেই তেনার শিষ্য বনে গেছি। তবে মাইনের কথাটা তেনাকে একটু বলে দেবেন।'

পাখি

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিঘৎ ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কি করে?

মাসিরা মাকে বললেন—'কিচ্ছু ভাবিসনে দিদি, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মা-র কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

বাবাও তাই বললেন—'বাঃ, তবে আর ভাবনা কি, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ঐ লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।'

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটিতে শিখে। আরো তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন—'আবার পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের, বোকা মেয়ে! লেখাপড়া চিরকালের জিনিস, ওকি কেউ ভোলে নাকি? আমি তো লেখাপড়া ছেড়েছি আজ পনেরো বছর, তবু সব ভুলে গেছি নাকি?'

'কিন্তু—কিন্তু—' কুমুর চোখে জল আসে। মাসিরা যান রেগে।

'ও আবার কি বুড়ো ধাড়ি আট বছরের মেয়ের আবার কথায় কথায় কান্না কি? সোনাঝুরি পাহাড়ে দেশ, লোকে বলে পরীদের বাস, কতবার বলেছি না তোকে? তারপর এই সময়ে সেখানে গাছে গাছে নাসপাতি পাকে, গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে এসে প্রায় মাটি ছোঁয়। ওখানে যাবার জন্য লোকে তপস্যা করে, তোর আবার চোখে জল কিসের? সবেতে দেখছি তোর বাড়াবাড়ি!'

মা বললেন—'সত্যি পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের মা? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন। এই তিন মাস ভালো করে পড়ে তোমাদের ইস্কুলের বড় দিদিমণিকে বললে হয়তো পরীক্ষা করে ওপরের ক্লাসে নিয়ে নিতেও পারেন।'

মাসিরা বললেন—'ন্যাকা! বেঁচে উঠেছিস্ এই যথেষ্ট, তা না হয়

একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কি এমন অসুবিধেটা হবে শুনি ?'

মেজমাসি বললেন—'আরে, বাবা তো আমাদের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করে, আমাদের তিন বোনকেই ইস্কুল ছাড়িয়ে একটি বছর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তা আমরা কেঁদে ভাসিয়ে ছিলাম নাকি ?'

ছোটমাসি বললেন—'আরে কাঁদব কি। ঐ সোনাঝুরিতেই ছিলাম সে বছরটা—রোজ রোজ পিক্‌নিক্‌ পড়াশুনোর বালাই নেই, মহানন্দে কেটে ছিল সারা বছর তারপর দাদুর তাড়ায় আবার সব ভর্তি হলাম। সক্কলের একটা করে বছর নষ্ট হল। কেউ কাঁদিনি।'

পরীদের কথাটা সত্যি মিথ্যা কে জানে, কিন্তু সোনামুনি, হাসি, বড়টুনু, রত্না সবাই ওপরের ক্লাশে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। তার চেয়ে মরে গেলে কেমন হোত ? ধাই মা বলত, 'বিষ্টির জলের ফোঁটা যেমন করে পুকুরের জলের সঙ্গে টুপ করে মিশে যায়, মরে গেলে মানুষের আত্মা ঐ রকম করে ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়।'

কুমুর বড় বোন সীমা রেগে যেত। বলত—'কি যে বল, সক্কলের আত্মা এক সঙ্গে কখনো মিশতে পারে ? ও বাড়ির দুষ্টু জগার সঙ্গে ভগবান কখনো মিশতে পারেন ? আমরাই মিশি না ; ঝোপের আড়ালে বিড়ি খায়, এমনি দুষ্টু ছেলে !'

তবে, ধাই মা নিশ্চয়ই মিশে গেছে। ধাইমা বড় ভালো ছিল।

কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিম্মার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মস্ত জানলার ধারে আরাম-চেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। মনে হল জলগুলো যেন নাচছে, লাফাচ্ছে, বড় খুসি হচ্ছে। আস্তে আস্তে প্যাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু। এমন সময় লাটু এসে ঘরে ঢুকল।

'ও কি হচ্ছে রে ? ঠ্যাং তুলছিস্‌ কেন ? ল্যাংড়ারা বুঝি ঠ্যাং তোলে ?'

কুমুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোয়। লাটু বিরক্ত হয়ে বলে—'ছি, ছি, ছি ; ছিঁচ কাঁদুনি !' বলে এক দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চক্‌চক্‌ করছে। দিম্মা বলছেন ওটা সত্যিকার বিল নয়, এখানকার লোকেদের

পাখি

শুকনোর সময় বড় জলের কষ্ট, তাই পাথরের ছোট বাঁধ দিয়ে ঝরণার জল ধরে রেখেছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কি বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে। সন্ধ্যের আগের কম আলোতে মনে হচ্ছে যেন রাশি রাশি শুকনো পদ্মফুল সমস্ত বিলটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

এক ছড়া কি যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বললে—'ঐ দ্যাখ্, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারীদের কি মজা! ইস্, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত! টপটপ্ গুলি করে মেরে, ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতাম, তাপ্পর ক্যায়সা খ্যাঁট হোত, ভেবে দ্যাখ্ একবার। ও কি, চোখ বুঁজছিস যে?'

কুমু বললে—'বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!'

দিদ্মাও তখন ঘরে এসে বললেন—'হ্যাঁ, ওদের ঐ এক চিন্তা, শুধু খাই আর খাই! ওর বাবাও তাই; পঁচিশ-তিরিশটা করে মেরে আনবে, তারপর ভাজো আর খাও!'

কুমু বললে—'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।'

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বললে—'আবার শীতের শেষে যেই না দখ্নে বাতাস বয়, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠকুরমা? দু-বার শিকারীরা পটাপট গুলি চালায়, আর মজা করে কুড়মুড়িয়ে বুনোহাঁস ভাজা খায়।

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম্ দুম্ করে বন্দুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল। দু-তিনবার এই রকম হল, তারপরে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, শিকারীরাও ঘরে ফিরল, পাখির ঝাঁক সেদিনের মত নিশ্চিন্ত হল।

দিদ্মার পুরনো চাকর রঘুয়া কুমু-লাটুর জন্য গরম লুচি, মুর্গির স্টু

আর ঘন দুধ নিয়ে এল। লাটু মহা খুসি ; কিন্তু মুর্গির স্টু আর কুমুর গলা দিয়ে নামে না! বললে—'দিম্মা, পাখিরা এখন কি করছে?'

লাটু একগাল লুচি মুখে নিয়ে বললে—'করবে আবার কি, ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে মি-মি কচ্ছে, তাও জানিস নে?'

কুমু ছোটবেলায় ঘুমোনোকে বলত মি-মি কচ্ছে। তাই নিয়ে লাটুর ঠাট্টা হচ্ছে। কি খারাপ লাটুটা!

আরো রাত হ'লে ফুটফুটে চাঁদ উঠল। ঘরের ওপাশে লাটু ছোট একটা নেওয়ারের খাটে শোয়ামাত্র ঘুমে অচেতন, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কুমুর চোখে ঘুম নেই। খালি মনে হয়, জানলার নিচে সরবতি লেবুর গাছে কিসের যেন ডানা ঝট্পট্ শুনতে পাচ্ছে। খাটের পাশেই জানলা, কিন্তু যাবার আগে কুমুর ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দিম্মা জানালা বন্ধ করে, ভারি পর্দা টেনে দিয়ে গেছেন। কুমু বিছানা ছেড়ে উঠে পর্দার পেছনে সেঁধিয়ে গেল!

মস্ত জানলার একটা কাঁচ আবার ছোট্ট একটা জানলার মতো আলাদা করে খোলা যায়, তাই দিয়ে মাথা গলিয়ে কুমু দেখতে চেষ্টা করে। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝিক্মিক্ করে, দোলে, নড়ে ; কিন্তু কিছু দেখতে পায় না কুমু, শুধু কানে আসে পাখির ডানার ঝট্পটানি। কেমন যেন মন কেমন করে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কুমু ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে জানলা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেলে, কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সরবতি লেবুগাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দু'টো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দু-টো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দু-টো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দু-টো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টন টন করতে থাকে ; হাত বাড়িয়ে বলে—'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।' পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আরেকটু ডাল ঘেঁষে বসে।

কানের কাছে লাটু বলে—'ও কি রে, ভোর বেলাতে ল্যাংড়া ঠ্যাং নিয়ে

পাখি

ডাল ঘেঁষে কোনমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে...

কি হোচ্ছে বল দিকিনি।'

চমকে ফিরে, দু' হাত মেলে জানলাটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে, কুমু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—'না, না, ওকে খাবে না।'

লাটু তো অবাক। 'কি আবার খাবে না?' কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখি দেখতে পায়। 'ইস্! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার! দাঁড়া, গাছে চড়ে ধরি ওটাকে।'

সিংহের মতো জোর আসে কুমুর গায়ে। দু-হাত দিয়ে লাটুকে ঠেলে বলে—'কক্ষণো না, কক্ষণো না! ওকে খেতে দেব না!' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। লাটু ওর খাটের ওপর বসে পড়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে। তারপর বলে—'চূণ হলুদ দিয়ে বেধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস্ তো ধরে আনি।'

কুমু বললে—'কিন্তু দিম্মা কি বলবেন?'

'কি আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!'

কুমু জোর গলায় বললে—'নিশ্চয় বাঁচে, চূণ হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।'

লাটু বললে—'কোন গরম জায়গায়?'

'কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।'

'দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।'

'কি করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?'

'তোর যেমন বুদ্ধি! এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?'

'কি খাবে ও, লাটু?'

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কি খাওয়াবে ওকে। তাহলে কি হবে? না খেয়ে যদি মরে যায়!

'এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? তোর খাবারের ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙ্গা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।'

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানলা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কি! লাটু তাকে খপ করে

ধরে ফেলে কিন্তু কি তার ডানা ঝট্‌পটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানলা গলে ঘরে এল। বললে—'ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস্‌ টলিস না। বড়রা বুনো জানোয়ার দেখলে ভয় পায়। বলবেন হয় তো, ছুঁস না ওটাকে। বলা যায় না তো কখন কি বলেন না বলেন!'

কুমু বালিশের তলা থেকে স্ক্রু দেওয়া নতুন পেনসিলটা লাটুকে দিতে গেল।

লাটু বললে—'ধ্যাৎ! বোকা! ঠ্যাং ল্যাংড়া বলে কি বুদ্ধিও ল্যাংড়া না কি!' বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কুমু পা ঝুলিয়ে খাটে গিয়ে বসল।

পাখিটাও ল্যাংড়া। ওর ডানা ল্যাংড়া। কুমু হাঁটতে পারেনা ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ঐ দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খাবারের ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভাল হলে কুমুও এখানে থাকত না। কলকাতায় মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধ্যেবেলায় সাঁতার শিখত, পুজোর সময় দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনো দিনও হয় তো কুমু দৌড়তে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ঐ এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে এটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের

দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আরেকবার জানলা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু খাটে ফিরে এল। খাটের পাশেই আয়না দেওয়া টেবিল, তার টানা থেকে মেজমাসির দেওয়া নীল রেশমি ফিতেটা বের করে চুল বাঁধল। বাঃ বেশ তো ফিতেটা। একটা বিস্কুট বের করে মুখে দিল, চমৎকার বিস্কুট, কিস্‌মিস্ দেওয়া। আরো খানিকটা বাদে যখন একটা বড় খুঞ্চিতে করে রঘুয়া কুমুর দুধ, পাঁউরুটি, নরম নরম ডিম সিদ্ধ নিয়ে এলো, তাতে নুন গোলমরিচ দিয়ে কুমু চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। এতটুকু রুটি, একফোঁটা দুধ বাকি থাকল না। রঘুয়া তো মহা খুসি।

'আমি বরাবর বলি বড়মাকে এখানকার হাওয়াই আলাদা। বলে নাকি কুমুদিদির খিদে হয় না, ঐ তো কেমন সব খেয়ে ফেলেছে।

রঘুয়া চলে গেলে পর ঘরটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। লাটু নিচে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে, দিম্মা রান্নাঘরে, লাটু সকাল সকাল ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাবে।

খনিক বাদে দিম্মা উপরে এসে ভারি খুসি।

'এই তো দিদিমনি কেমন চুল আঁচড়ে নীল রিবন বেঁধেছে, খুব ভালো দেখাচ্ছে। আবার খিদেও হয়েছে শুনছি। বাড়িতে নাকি কান্নাকাটি করতে, খেতে না? কেমন ভালো জায়গাটা বলতো? তাই লোকে বলে এটা পরীদের দেশ, ঐ বাঁধটাকে বলে পরীতলা।'

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে চড়ছে, একটু-একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাট, এই বুঝি দিম্মা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, 'ফেলে দে ওটাকে বড় নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে, ভালো ঝুড়ি!'

ঘরের মধ্যে টুকিটাকি দু'একটা কাজ সেরে দিম্মা গেলেন চলে। কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানলার বাইরে সোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাট; এই বুঝি বেড়াল পাখি খেল। কিন্তু খাবে কি, অত বড় পাখি তার তেজ কত! দিলে ঠুক্‌রে ঠেলে বেড়ালের মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে একবারে ভাগিয়ে। দু-টো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে

ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল। খোঁড়া তো হয়েছে কি, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দু-টোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

দিস্মা এলে কুমু বললে—'স্নানের ঘরে আমার জামা তোয়ালে তুমি ঠিক করে দিও; আমি নিজেই স্নান করব।'

দিস্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—'আজ অনেক হেঁটেছ, আজ থাক, দু'দিন বাদে কোরো, কেমন?'

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কি যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙগা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকলো। লাটু তখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কি! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলো, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচরে পাঁচরে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ঔষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

পরদিন কুমু লাটুর সঙ্গে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়তে বসল। মাস্টারমশাই উপরে এলেন—কি ভালো উনি, কুমুকে বেশি করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, এমনি মন দিয়ে পড়লে উনি কুমুকে এই তিন মাসে এমন করে তৈরি করে দেবেন যে বছরের শেষে পরীক্ষা দিয়ে কুমু দিব্যি উপরের ক্লাশে উঠে যেতে পারবে।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখি একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুর বেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে—"মা বাবা, তোমরা ভেবোনা, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, আমার নতুন ফ্রকগুলো পাঠিয়ে দিও, রত্নাদের বলো আমি পরীক্ষা দেব, আমি আরেকটু

ভালো হলে নিজে নিচে নামব, এখন রঘুয়া আমাকে রোজ বিকালে কোলে করে বাগানে নামায়, সরবতি লেবুগাছের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। রাতে আমি নিচে সবার সঙ্গে খাই।"

আরো লিখছিল—"সরবতি লেবুগাছে একটা বুনো হাঁস থাকে, তার ডানা ভেঙ্গে গেছিল, এখন সেরে যাচ্ছে।" কিন্তু সেটা আবার কেটে দিল, জানতে পেরে যদি দিম্মা পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন।

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পাখিটাতো ভিজে চুপ্পুড়। ঝুড়ি ছেড়ে ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে সেঁধুল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠলো, দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে পাখিটা উড়ে গেল। দুপুরে শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তীরের মত নক্সা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কি মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেবে এসে মগডালে বসল। হাঁসরা গিয়ে পরীতলায় নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পর দিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইলো না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা যেন একটু ছোটই মনে হল।

কুমু বলল—'দিম্মা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।'

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দু-জনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বললে। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'ওমা, বলিস্‌নি কেন, আমিও যে পাখি দেখতে ভালোবাসি!'

ম্যাজিক

ছোট বেলায় প্রায়ই আমাদের চাকর বলত পাশের বাড়ির বড় বাবুর্চি নাকি জাদু জানে ; নাকি সাহেবের খানার জন্য এই মোটা মোটা মুর্গি এল, তা সে সাহেব তো চোখে দেখল ছাই, বাবুর্চির হল পেট পুজো ! কিন্তু ওমা ! খাবার সময় ঠিক থালা ভরা ভুরভুর গন্ধ লাল্‌চে ভাজা মোগলাই মুর্গি ! বাবুর্চির মাইনেও বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর ! তাই দেখে আমাদের চাকরটার সে কি হিংসে ! সেও নাকি পাহাড়ের উপরে দেওতাস্থানে গিয়ে সাদা মুর্গি বলি দিয়ে জাদুমন্ত্র শিখে আসবে, তা'হলে সে ইচ্ছে মতো বেড়াল হতে পারবে, বাঘ হতে পারবে, পেট ভরে খেতে পারবে, কারো বাড়িতে কাজ করতে হবে না, হেনা-তেনা কত কি !

তাই শুনে আমাদের বুড়ি ঝি বলতো, 'ওমা, এ আবার কি ! আমার দাদামশাই মুখের মধ্যে প্যাঁচার চোখের মণি পুরে, বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত, আর তাকে চোখে দেখা যেত না, যেখানে খুসি আসত, যেত, কেউ টেরও পেত না।'

আমরা বলতাম, 'কোথায় সে এখন, আমরা অদৃশ্য হওয়া শিখবো !' বুড়ি বলত, 'ওমা, এরা আবার কি বলে ! বলি, সে কবে না খেতে পেয়ে পটল তুলেছে, তার কাছে আবার শিখবে কি !'

আমাদের পাশের বাড়ির মাসিমারা একবার রাঁচি গিয়ে সাধুদের দেখেছিলেন, গনগনে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে, পায়ে একটু ফোস্কা পর্যন্ত পড়ে না। তা সে নাকি জাদু নয়। বারবার স্নান করে করে শরীরটাকে আগুন-সই করে নেয় ওরা। কিন্তু ঐ মাসিমাই নাকি ছোটবেলায় জাদুকর দেখেছিলেন, তারা চোখের সামনে আমের আঁটি থেকে গাছ বের করে, গাছ বড় করে, তাতে বোল ধরিয়ে, ফল পাকিয়ে, সকলকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছিল।

ছোটবেলা থেকে এমনি সব ম্যাজিকের গল্প শুনতাম আমরা। সেকালের সাহেবদের বইতে প্রায়ই আরেকটা এদিশি ম্যাজিকের কথা পড়া যেত, সেও ভারি অদ্ভুত। জাদুকর মোটা একগাছি দড়ি মাটিতে ফেলে, সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে সুরু করে অমনি দড়ি গাছাও সাপের মতো

কিলবিলিয়ে ফণা ধরে ওঠে। তারপর সোজা হয়ে আকাশে উঠতে থাকে; শেষ পর্যন্ত দড়ি খাড়া হয়ে স্থির হয়ে যায়। উপরটায় একটু মেঘের মতো জমা হয়ে থাকে, তার উপরে আর দেখা যায় না।

তখন একটা লোক ছুটে এসে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। আর অমনি আর একটা লোকও তলোয়ার হাতে তাকে তাড়া করে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ে সেও অদৃশ্য হয়ে যায়। শূন্যের উপরে খুব খানিকটা মারামারির শব্দ হয়, উপর থেকে এটা ওটা, পাগড়ি, নাগরাই ইত্যাদি নিচে পড়তে থাকে। শেষ অবধি জাদুকর আবার বাঁশির সুর বদলে দড়ি গুটিয়ে আনে। যেই বাঁশি থামে, দড়িগাছিও ভালো মানুষের মতো দড়িগাছি হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে।

আর সেই লোক দু-টো? তারাও খানিকবাদে ঘাম মুছতে মুছতে অন্যদিক থেকে এসে যে যার পাগড়ি চটি পরে নেয়।

এই ম্যাজিক দেখবার জন্যে সেকালের সায়েবরা ছিল পাগল। অথচ এখন কেউ এর নামও করে না।

বড়রা বলতেন, 'ম্যাজিক ফ্যাজিক কিছু নয়, সব বুজরুকি, হাতসাফাইয়ের ব্যাপার—যাকে বলে চোখে ধুলো দেওয়া, সে ছাড়া আর কিছু নয়।'

একবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরা একটা লোক এল। এসে বলল সে এক টাকাকে দু'টাকা করে দেবার বিদ্যে জানে। এমনকি নমুনা দেখাবার জন্যে দিলেও একটা দশ টাকার নোটকে দু-টো দশ টাকার নোট ক'রে। কিন্তু এই জাদু দেখাবার জন্য তাকে পাঁচ টাকা বখশিস দিতে হবে!

আমাদের জাদু দেখবার খুবই ইচ্ছে ছিল। তা ছাড়া, যার যা টাকা কড়ি আছে, সব দু-গুণ হয়ে যায় তো মন্দ কি! কিন্তু বড়দের জন্যে আর কিছুই করা গেল না। তাঁরা বললেন, 'এক টাকাকে যদি দু-টাকাই করতে পারে তো আবার পাঁচ টাকা চায় কেন? নিজের টাকাগুলোকে দুগুণ, চারগুণ, আটগুণ করে নিলেই তো পারে।' এই বলে দিলেন লোকটাকে ভাগিয়ে। ইস্, আমাদের সে যে কি কষ্টই হয়েছিল!

আরো কতরকম ম্যাজিক দেখেছি, হতে পারে হাত সাফাই, কিন্তু অমন হাত সাফাই যার তার করার সাধ্য নেই। একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক, দেশলাই কাঠি নাচাত। নিজে দশ হাত দূরে বসতো, দর্শকদের কাছ থেকে এক বাক্স দেশলাই চেয়ে, সেটাকে খুলে মাটিতে ফেলে রাখত। তারপর ঐ অতদূরে বসে সে যা বলত, দেশলাই কাটিরা তাই করত।

লাইন করে বাক্স থেকে বেরিয়ে মার্চ করত, লাফাত, শুয়ে পড়ত, রাইট অ্যাবাউট্ টার্ণ করে আবার গিয়ে বাক্সে ঢুকে পড়ত। করুক তো কেউ এইরকম বুজরুকি! তাকেই আমরা জাদুকর বলতে রাজী আছি।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখেছিলাম বত্রিশ বছর আগে শ্রীনিকেতনের কাছে লাভপুরের রাস্তায়। পুজো সেবার খুব দেরিতে পড়েছিল। পুজোর ছুটির পর যখন আবার ইস্কুল খুলল, তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। একদিন আগে এসে পৌঁছে শুনি নাকি শ্রীনিকেতনের কাছে জাদুকরের তাঁবু পড়েছে, সে অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

গেলাম সবাই দল বেঁধে। তখন সাইক্ল রিক্সা, বাস ইত্যাদির বালাই ছিল না, সন্ধ্যা বেলায় সব হেঁটে মেরে দিলাম। পৌঁছে দেখি এ কেমন জাদুকর, পয়সা কড়ি নেই, তাঁবুর মাথায় এত বড় বড় ছ্যাঁদা। জাদুকরদের ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরণে।

সার্কাসের তাঁবুর মতো ব্যবস্থা, মাঝখানটা ফাঁকা, চারদিকে গোল করে গ্যালারি বানিয়েছে। একটি মাত্র পেট্রোম্যাক্স বাতিতে সবটা আলো হয়ে রয়েছে।

জাদুকররা ছিল তিনজন। কিন্তু আমরা সবাই গোল হয়ে বসামাত্র, সবচাইতে ছোট যে তাকে বড়রা দু-জন চেপে ধরে বলল, 'এ লোকটা ভারি দুষ্টু। একে পুঁতে রাখাই উচিত, নইলে খেল্ দেখাতে দেবে না।'

এই বলে কথা নেই বার্তা নেই, ঐ খানেই একটা গর্ত খোঁড়াও ছিল, তার মধ্যে ওকে পুরে দিব্যি মাটি চাপা দিয়ে খেল্ শুরু করে দিল। সে রকম আশ্চর্য খেল্ আর আমি জন্মে দেখিনি, বোধ হয় দেখবও না।

বড় জাদুকর প্রথমে একলা জঘন্য ময়লা রুমাল বের করে, সকলকে সেটা পরীক্ষা করতে বলল। এমনি নোংরা সেটা যে কারো হাতে ছুঁতে ইচ্ছা করল না, কিন্তু খুব কাছে এনে, টর্চ জ্বেলে, ভালো করে সবাই দেখলাম, একটা সাধারণ অতি ময়লা রুমাল ছাড়া আর কিছু নয়। সেজ জাদুকর তারপর আরো ময়লা একটা রুমাল বের করে ঐ রকম ভাবে সবাইকে দেখিয়ে নিল। সাধারণ একটা রুমাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর তারা করল কি, পাঁচটা করে গিঁট দিয়ে, রুমালগুলোকে ন্যাকড়ার পুতুলের মত বানিয়ে নিল। মুণ্ডু, হাত, পা, সব হল। সবাইকে ভাল করে দেখিয়েও নিল।

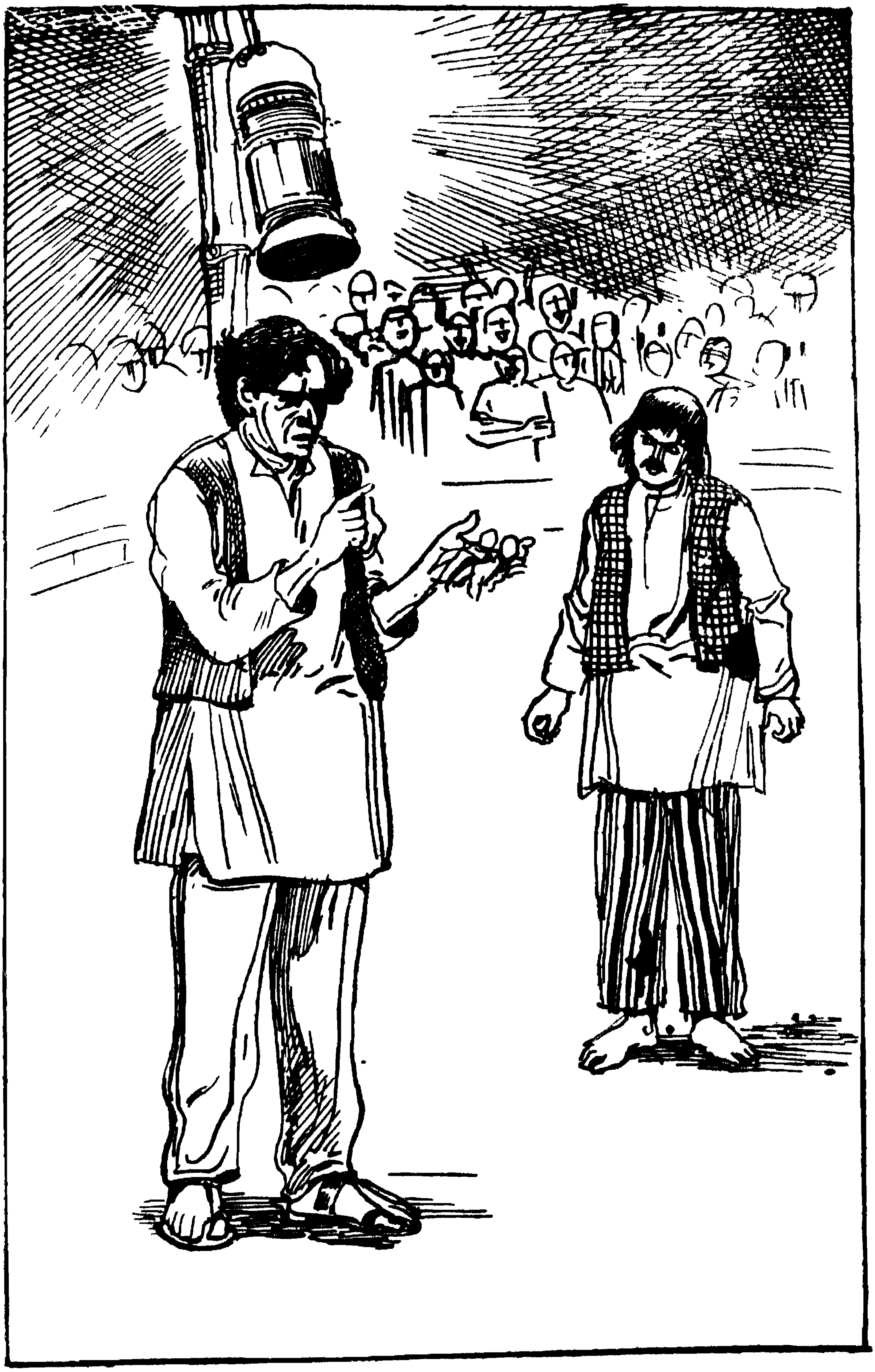

বড় জাদুকর এবার ন্যাকড়ার পুতুল দুটো·

বড় জাদুকর এবার ন্যাকড়ার পুতুল দু-টোকে নিজের হাতের তেলোয় শুইয়ে বলল, 'উট্ দেখি, খেল্ দেখা'! এই বলে যেই না তাদের গায়ে ফুঁ দিল, অমনি পুতুল দু'টো জ্যান্ত হয়ে তড়বড়িয়ে উঠে, ওর হাত থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়লো।

জাদুকর তখন তাদের নিয়ে কি খেলটাই দেখাল, সে আর কি বলব। তারা নাচল, কুঁদল, কুস্তি করল, ডন্-বৈঠক করল, মার্চ করল, হ্যাণ্ড-সেক করল। জাদুকর যা বলে, বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাই করে। দেখে দেখে আমরা সবাই হাঁ!

শেষটা মেজ জাদুকর অসাবধানতা বশতঃ ওদের দিল মাড়িয়ে। বড় জাদুকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতেই, ভারি অপ্রস্তুত হয়ে মেজ পা উঠিয়ে নিল। কিন্তু পুতুল দুটির রাগ দেখে কে! ঘুষি বাগিয়ে তারা মেজ জাদুকরকে আক্রমণ করে সমানে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মেরে যেতে লাগল। কিছুতেই বড় জাদুকরের মানা শুনল না।

সেও তখন রেগে গিয়ে ওদের হাতে তুলে নিল। তা তারা হাতে থাকবে কেন, থপ থপ করে লাফিয়ে নেমে আবার তেড়ে যেতে চায়! আমাদেরি কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। শেষ অবধি বাধ্য হয়ে বড় জাদুকর ওদের ধরে, আবার যেই গায়ে ফুঁ দিল, অমনি তারা শুয়ে পড়ে আবার রুমালে গিঁট দেওয়া ন্যাকড়ার পুতুল হয়ে গেল। বড় জাদুকর গিঁট খুলে, রুমাল ঝেড়ে আবার আমাদের দেখিয়ে গেল।

খেলও ভেঙ্গে যাচ্ছে, এমন সময় বড় জাদুকরের হঠাৎ মনে পড়াতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছোটটাকে বের করে আনল। সেও ঘণ্টা-খানেকের বেশি মাটিতে পোঁতা থাকাতে দেখলাম খুব চটেছে। মুখ লাল করে কাপড় থেকে ধুলো মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে, গজ্ গজ্ করতে করতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল!

আমাদের কারো মুখে আর কথা সরে না। ভাবলাম একেও যদি হাত-সাফাই বলে, তাহলে জাদুবিদ্যা আবার কি? তবে একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, 'এত জাদুই যদি জানে লোকগুলো তাহলে একটা বাঁকা টিনে করে সকলের কাছে থেকে দু-আনা করে পয়সা নিচ্ছিল কেন?'

ডাইরি

মিথ্যা কথা বলা যে এমন কিছু অন্যায় এ আমি বিশ্বাস করি না, এমন কি মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলার দরকার হয়। আমি ত প্রায়ই মিথ্যা কথা বলি। আরও কত কি করি! বড়দের পিছনে থেকে ভ্যাংচাই, কলা দেখাই, বক দেখাই। মাস্টারমশাইদের কথা শুনি না, মখোমুখি জবাব দিই, পড়া ভাল করে তৈরি করি না। এরজন্য যদি কেউ আমার নিন্দা করে ত আমি থোড়াই কেয়ার করি।

ভাল ছেলেদের ত আমি ভীতু মনে করি, খোসামুদে মনে করি। পাছে বকুনি খায় তাই তারা ভয়েই আধ-মরা, বড়দের কোনরকমে খুসি করতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা! এঃ রাম, ছিঃ! আমাকে দেখ। দিব্যি আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই, যা খুসি তাই বলি, যা ইচ্ছে করি, কে আমার কি করতে পারে? বড়দের কথা আমার ঢের ঢের জানা আছে। তারা নিজেরাই যথেষ্ট দোষ করে; আবার আমাদের বলতে আসে। ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না।

বেশ আছি, খাসা আছি, দিদিমার কাছে থাকি, দিদিমা আমাকে সোনামণি বলে ডাকেন, ভাবেন আমার মত চাঁদের টুকরো আর হয় না; কেউ কিছু বললেও বিশ্বাস করেন না। এর থেকেই ত বড়দের বুদ্ধির দৌড় বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক্ বেশ ছিলাম, এমন সময় সেই বাঁদরের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। চোখ বুজলেই বাঁদর। হাড়-জ্বালাতন হয়ে গেলাম। ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করত না। হয় বাঁদরটা ফল চুরি করে যাচ্ছে, নয় ত কাগজপত্র ছিঁড়ে একাকার করছে, নয় কাউকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে খিমচোচ্ছে, নয় ভেংচি কাটছে, দাঁত খিচোচ্ছে। মোট কথা, এমন পাজী বাঁদর আমি জন্মে দেখিনি। অথচ রোজ রাত্রে চোখ বুঁজেছি কি বাঁদর এসে হাজির। কাউকে বলতেও বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। মা-বাবাকে চিঠি লিখে কি আর এসব বলা যায়? দিদিমা ত শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হয়ত, ফলে আমাকে জোলাপ খেতে হবে?

তারপর বাঁদরটা ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। জাগা অবস্থাতেও এসে হাজির হত। ইস্কুল থেকে ফিরছি, বইগুলো শূন্যে ছুঁড়ছি আবার

ধরছি, মাঝে মাঝে পারছি না—পড়ে যাচ্ছে, মলাট খুলে যাচ্ছে। চীনা-বাদাম কিনলাম, পান কিনলাম, পা দিয়ে খুব খানিকটা ধুলো উড়োলাম। ও পাড়ার গোবিন্দবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারী বিরক্ত হলেন। আমিও তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কানের কাছে এইসা সিটি দিলাম যে ভদ্রলোকের পিলে চমকে উঠলো।

হঠাৎ দেখি, আম বাগানের তলায় বাঁদরটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, নিজেই পিঠ চাপড়াচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, নিজের ল্যাজ ধরে নিজেই নাচছে কুঁদছে। ভাবখানা যেন ওর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! গোবিন্দবাবুও তাই দেখে হেসে বললেন, 'বা, বাঃ, তোর মাসতুতো ভাইও এসে হাজির হয়েছে যে।'

মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে তাকে কিছুই বললাম না, ভাবতে পার?

বাড়ি এসে দেখি আমার পিসিমা এসেছেন, তাঁর ননীর পুতুল মেয়ে ময়নাকে নিয়ে। মেয়েটি নরম, কচি, হাঁদার একশেষ। প্রথমটা একটু মাকড়সা-টাকড়সা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তা সে আবার দাদা দাদা করে আমাকেই জাপটে ধরল। কী আর করি, শেষটায় মাকড়সাটাকে তাড়িয়ে দিতে হলো। মেরেই ফেলতাম, কিন্তু ময়নাটা মাকড়সা মরে যাবে শুনে কেঁদেই সারা, অগত্যা জলের ছিটে দিয়ে তাড়ালাম। মাসিমাটি আমার আবার বেশ আছেন। ঘরে এসেই দেয়ালে জল ঢালার জন্য চেঁচামেচি লাগিয়েছেন! ময়না তখন বলল, 'না মা, দাদাকে ব'ক না, ও মাকড়সা তাড়িয়েছে।'

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বাঁদরটা একজন মোটা পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, পারছেনা, আমাকে ডাকছে। আঁতকে জেগে গেলাম।

পরদিন ছুটি ছিল, ময়নাকে কয়েকটা আম-টাম পেড়ে দিয়েছিলাম, অবিশ্যি হেডমাস্টারমশাই-এর বাগান থেকে চুরি করে। রাত্রে চোখ বুঁজতে না বুঁজতে বাঁদর আর পাদ্রী দু-জনে এসে উপস্থিত। দেখলাম পাশাপাশি হাঁটছে, এ ওর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল, যখন তখন বাঁদর দেখতে লাগলাম, যেখানে সেখানে পাদ্রী সাহেব মনে হতে লাগল। ইস্কুলে আমার দস্তুরমত নাম খারাপ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ কোন ক্লাসে কোনও গোলমাল করলাম না, অবিশ্যি পড়াশুনোও করলাম না। বাঁদরটারও যেন কেমন মন খারাপ মনে হতে লাগল। একদিন বাড়ি ফেরবার পথে দেখলাম

হঠাৎ দেখি, আম বাগানের তলায়

ডাইরি

আমগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হাঁড়িপানা মুখটি করে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, একজন পাদ্রীসাহেব হাসি-হাসি মুখ করে যাচ্ছেন। কি যেন মনে হল, একটা ঢিল তুলে পাদ্রী সাহেবের দিকে ছুড়ে মারলাম। অমনি বাদরটা ফিক করে হেসে ফেলল।

সেদিন অনেকগুলো অন্যায় করে ফেললাম, সবগুলো অবিশ্যি ঠিক আমার দোষ নয়। পেয়ালা ভাঙলাম, মিছিমিছি বললাম ময়না ভেঙেছে, ময়নার টিকি টেনে, তাকে বক দেখিয়ে, কাঁদিয়ে-টাদিয়ে, কলা দেখিয়ে, বেরিয়ে গেলাম।

পাড়ার কতকগুলো ছেলের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হৈ-চৈ করে বেড়ালাম; কত লোকের জানলার কাচ ভাঙলাম, কুকুর তাড়া করলাম, গোবিন্দবাবুর টিয়া পাখিটা ছেড়ে দিলাম, আরও কত কি যে করলাম তার ঠিক নেই। রাত্রে ফিরলাম দেরি করে, খেতে বসে গোলমাল করলাম—এ খাবনা ও খাবনা। দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; মাসিমা বললেন—'দুটো কষে চড় লাগালে ছেলে সিধে হয়ে যাবে।' বললাম—'তোমার ছেলেকে চড় লাগিও, খবরদার আমার কাছে এসো না।' বলে উঠে দে দৌড়! সিঁড়িতে মনে হল সারি সারি বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে বেরিয়ে গেলাম। গেটের পাশে আমার বন্ধু ন'টে দাঁড়িয়ে।

'কেন রে? কী হয়েছে?'

'বটু তুই টিয়া পাখি ছেড়ে দিলি, আর গোবিন্দবাবু হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে নালিশ করেছেন যে, আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাবা শুনলে ত আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন।'

বললাম—'চল, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি।'

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম—'ন'টে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখত' কেউ ফলো করছে কিনা!'

ন'টে বললে—'না ত'।'

'একজন পাদ্রীসাহেব কি একটা বাঁদর নেই বলতে চাস?'

ন'টে বললে—'কই না ত!' তবে ঐ গাছটাতে বাঁদর থাকতেও পারে। কেনরে?'

কিছু বললাম না, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি এসে গেলাম। তারপর তাকে বল রে, গোবিন্দবাবুকে ডাকরে, অপমানের একশেষ, জরিমানা ইত্যাদি—সে আর বলে কাজ নেই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাদ্রী সাহেব আর বাঁদর কোলাকুলি করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বাঁদরটা কোলাকুলি করছে বটে, কিন্তু, হাত বাড়িয়ে পাদ্রী সাহেবের পিছনে চিমটি কাটতে চেষ্টা করছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপরই জ্বর-টর হয়ে মা বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম, আর পাদ্রী সাহেবকে বা বাঁদরটাকে দেখিনি। মাঝে মাঝে খটকা লাগে।

ইচ্ছেগাই

মহালয়ার দিন বাড়ি এসেই বোকোমামা পকেট থেকে একটা কাঁচের তৈরি রাগী গরুর মূর্তি বের করে বলল—'এটাকে একটা সাধারণ জিনিস মনে করিস না যেন, এর পেছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে।' টিংটিঙে রোগা ছোট্ট একটা গরু হাতের তেলোয় ধরে যায়, চার ঠ্যাং এক জায়গায় করে ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের পায়ে কালো রং দিয়ে ছোট্ট একটা 'ন' লেখা।

আমরা বললাম—'ওমা, এমন সুন্দর কাঁচের গরু কোথায় পেলে, বোকোমামা!'

বোকোমামা যেন আকাশ থেকে পড়ল। দু-চোখ কপালে তুলে বলল—'কাঁচ? হ্যাঁরে ইডিয়ট, তোরা কি স্ফটিকও চিনিস না? এটার গায়ে এক টুকরো রেশম জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেখিস, রেশম পুড়বে না। কাঁচ না আরো কিছু!

তাই শুনে নগা কোত্থেকে এক বাক্স দেশলাই বের করে, বোকোমামার রেশমি রুমাল ধরে টানাটানি করতে লাগল আর আমরা বাকিরা সবাই গোল হয়ে ওদের ঘিরে দাঁড়ালাম। বোকোমামা বিরক্ত হয়ে রুমালটি পকেটে পুরে, গরুটিকে দরজার ওপরের তাকে তুলে রেখে বলল—'জ্যাঠামোই করবি, নাকি গল্পটি শুনবি, তাই বল?'

নগা বললে—'ওমা, গল্প নাকি? এই যে বললে বিরাট ইতিহাস?'

'ঐ, ঐ একই হল, গল্প মানে সত্যি গল্প। তবে শোন্।'

ইচ্ছেগাই

নগা বললে—'আগে বল, কোথায় পেলে ওটাকে ?'

'পাব আবার কোথায় ? ওসব জিনিস কি আর কোথাও তৈরি হয় যে পাব ? দেখেছিস কখনো ওরকম আরেকটা ? উত্তরাধিকারসূত্রে ওটাকে পেয়েছি। আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠায় পুরনো জিনিসের সঙ্গে ছিল।'

আমি বললাম—'আর ইতিহাসটাকে জানলে কি করে ? কাল তো মা বলেছিলেন যে—আচ্ছা, আচ্ছা, এই থামলাম, তুমি বল।'

বোকোমামা বলতে শুরু করল—'আমার ঠাকুরদার অবস্থা ভালো ছিল না। তিন ভাই একসঙ্গে থাকেন বলে চলে যেত ; তার ওপর ঠাকুরমার যা মেজাজ, বাড়ির চালে কাক-চিল পর্যন্ত বসতে ভয় পায়। ঠাকুরদা বেচারি তাঁর ভয়ে জুজু। একদিন পাড়ার পাশার আড্ডায় বড্ড রাত করে ফেলেছেন, তার ওপর খাজনার টাকা জমা দেবার কথা ছিল, ভুলে তো গেছেনই, উপরন্তু টাকাগুলোকেও বাজিতে হেরেছেন।'

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল—'কোত্থেকে জানলে এত কথা ?'

বোকোমামা আমার দিকে ফিরে বললে—'আমাদের বংশপরিচয়ে লেখা আছে। হল তো ? তারপর শোন। হয়তো মাঝরাতও পেরিয়ে গেছে, একটু আগেই খুব বৃষ্টি পড়েছে, তারার আলোতে খুব সাবধানে গুটি গুটি এগুচ্ছেন, এমন সময় কানে এল—গাঁ—ক্ ! বাঘ মনে করে আরেকটু হলেই ঠাকুরদা পগারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চোখে পড়ল পগারের কিনারায়, এক হাঁটু চটচটে কাদায় ডুবে একটা হাড়-জিরজিরে গরু কাতর চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠাকুরদার মনটা ছিল বড়ই দয়ালু, শরীরেও ছিল অসুরের মতো শক্তি, কাজকর্ম কিছু করতেন না তো, কাজেই সে শক্তির একটুও খরচ হয়নি। এবার নিমেষের মধ্যে মালকোঁচা মেরে, হাতের চেটোয় দু-পোঁচ থুথু মেখে নিয়ে, গরুর পেছন দিকে এমনি এক ঠেলা মারলেন যে, চু—ক্ একটা শব্দ করে গরুটা কাদা থেকে উঠে এসে রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়ল। শীতে বেচারি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে।'

'কি আর করবেন ঠাকুরদা, ওটাকে অমনভাবে ফেলে যেতে মন সরল না ; তাই আঁজলা আঁজলা পগারের জল তুলে যথাসাধ্য পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে, নিজের এণ্ডির চাদরটা দিয়ে ভালো করে সর্বাঙ্গ মুছে

দিলেন। এটা যে কত অসমসাহসিকতার কাজ, যারা আমার ঠাকুরদার ঠাকুমাকে চেনে না, তারা বুঝবে না।

'যাই হক, তারপর দু-মুঠো দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে গরুটাকে খেতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদা আবার বাড়িমুখো হলেন। ততক্ষণে মাথার ওপরকার তারাগুলো পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা চলে পড়েছে। আজ রাতে কপালে কি আছে কে জানে। অন্ধকার আমগাছের ছায়া দিয়ে আরো গজ পঞ্চাশেক এগিয়েছেন এমন সময় পেছনে শোনেন খপ্ খপ্ খপ্ খপ্! আঁৎকে উঠে ফিরে দেখেন—গরুটা করুণমুখে কাদা ভেঙেগ ভেঙেগ সঙেগ চলেছে। ঠেলা দিলেন, তাড়া দিলেন, এমন কি একটা কাঠি দিয়ে সপাসপ্ দু ঘা লাগিয়েও দিলেন, কিন্তু গরু গেল না। খালি দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।'

'শেষটা ঠাকুরদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'নেহাৎই যাবি না যখন চল্ তাহলে, ছেলেপুলেগুলো একটু দুধ খেয়ে বাঁচুক। গরু এনেছি দেখে গিন্নীর রাগও খানিকটা পড়তে পারে। আ, আ, আ, তু, তু, তু,।'

'বাড়ি পৌঁছে, সামনের দিক দিয়ে না ঢুকে ঠাকুরদা বাড়ির পেছনে রান্নার চালাঘরের দিকে গেলেন। সামনের ঘর দুটোতে তাঁর দাদা, মেজদা শুয়ে থাকেন, তাঁদের না চটানোই ভালো মনে হল। চালা ঘরের দরজার হুড়কোটাকে এক একটা লম্বা মানুষ ওপরের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে ফেলতে পারে, এটা ঠাকুরদা জানতেন। আজ রাতের মতো সেখানেই না হয় আশ্রয় নেওয়া যাবে। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, ভাবছেন —আহা যদি একগোছা টাকা আর একজোড়া একশো ভরির রুপোর তাগা গিন্নীর পায়ের কাছে ফেলে দিতে পারতাম, তা হলে গিন্নী আমাকে কত আদর করত! ওরে গরু এটা যদি করে দিতে পারতিস, তা হলে আমার কোনো ভাবনাই ছিল না। নইলে আজ এই খালি পেটে মাটিতে শোয়াই আমার কপালে আছে। এই অবধি বলেই তো ঠাকুরদার চক্ষু স্থির! ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে ইয়া বড় সিঁদকাটা! তার মানে চোর ঢুকে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক থেকে তিন পুরুষের জমানো ভারি ভারি খাগড়াই কাসার বাসনগুলো পাচার করেছে। হায়! হায়! দামী জিনিসের মধ্যে ছিলতো শুধু ঐ! এবার তাও গেল।'

'এমন সময় গরুটার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে ফিরে দেখেন, উঠোনের

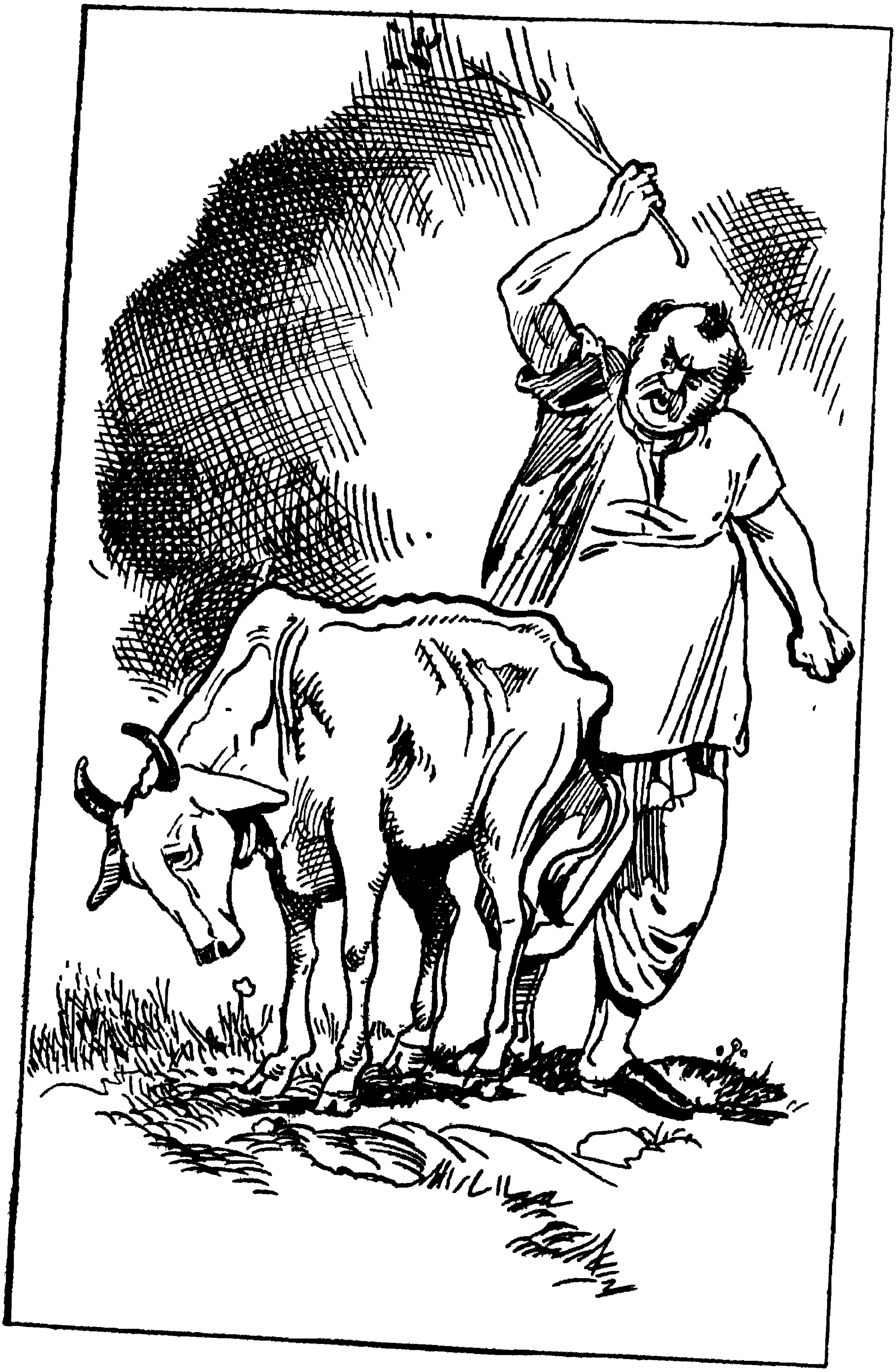

একটা কাঠি দিয়ে সপাসপ দু-ঘা লাগিয়েও দিলেন

কোনায় ভাতের ফেন ঝাড়বার গামলার আড়ালে মিটমিট করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে, তার সামনে মাটির ওপর পড়ে আছে এক তোড়া টাকা আর এক জোড়া রুপোর তাগা। চোররাই যে অন্য কোথাও থেকে এগুলো সরিয়ে এনে এখানে রেখে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক নিয়ে ব্যস্ত আছে, সে বিষয়ে ঠাকুরদার মনে কোনো সন্দেহই রইল না।'

'নিমেষের মধ্যে সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে, চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়েই এমন বিকট চিৎকার জুড়ে দিলেন যে, প্রথমটা নিজের কানে যেতে নিজেরই পিলে চমকে উঠেছিল। তারপরেই বুঝলেন, প্রভুভক্ত গরুটাও সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঁচাচ্ছে বলে ওরকম বীভৎস শোনাচ্ছে। আর যাবে কোথা, দেখতে দেখতে দা কুড়ুল নিয়ে বড়দা মেজদা তো বেরিয়ে এলেনই, লাঠি সোঁটা কাস্তে হাতে পাড়ার লোকেরাও এসে জুটল। তারি ফাঁকে তেলমাখা রোগা রোগা তিনটে লোক পাঁই পাঁই ছুট লাগাল। দু-একজন ধরতে চেষ্টা করল বটে কিন্তু চোরদের তেল চুকচুকে গা হাতের মধ্যে থেকে সুড়ৎ করে পিছলিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'মোট কথা, চোর ধরা গেল না বটে কিন্তু শুধু যে নিজেদের বাসনের গোছা বেঁচে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে রাশি রাশি চোরদের জিনিসও পাওয়া গেল, রুপোর পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ এইসব। কে জানে কোত্থেকে এনেছে। দাদা মেজদারা অবিশ্যি তখুনি বলতে লাগলেন—ইস্, দেখেছ, বাবার পুজোর জিনিসগুলোও নিচ্ছিল, এত বড় আস্পর্ধা! এই বলে তাড়াতাড়ি সব কিছু সিন্দুকে তুলে ফেললেন, কিন্তু পাড়ার লোকের আর জানতে বাকি ছিল না যে, গত পঁচিশ বছর ধরে সিন্দুকের মধ্যে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঝাঁপিটাতে খালি একটা সিঁন্দুর মাখানো ফুটো পয়সা ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু টাকার তোড়া আর তাগা কারো চোখে পড়েনি। ভাসুরদের সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন সুযোগে তাঁর হাতে টাকা আর গয়না গুঁজে দিতেই নিঃশব্দে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে সবাই চলে গেলে গরুটাকে রান্নাঘরে বন্ধ করে রেখে, ঘরে গিয়ে ঠাকুরদা দেখেন—আসন পেতে, ভাত বেড়ে, পাখা হাতে ঠাকুমা বসে আছেন। ঠাকুরদা ভাবলেন, এতদিন বাদে বোধ হয় তাঁর কপাল ফিরেছে।'

'পরদিন চোখে মুখে রোদ পড়াতে যখন ঘুম ভাঙল তখন কিন্তু ঠাকুমার অন্য চেহারা।—কোত্থেকে এই মড়াখেকো গরুটাকে জোটালে

বল দিকিনি ? হতচ্ছাড়ি রাতারাতি রান্নাঘরের খড়ের চালের আধখানা খেয়ে শেষ করেছে। ঐরকম একটা হাড়-জিরজিরে জানোয়ার পোষে কেউ ? ওর মালিক ওকে নিশ্চয় খেদিয়ে দিয়েছে পাছে বাড়িতে মরে, একটা অকল্যাণ ডেকে আনে। আর তুমি কিনা খাজনার টাকা দিয়ে তাই কিনে নিয়ে এলে ঘরে! পেছনের পায়ে আবার দেখছি একটা 'ন' লেখা রয়েছে, এবার দারোগা এসে হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাক আর কি!'

'ঠাকুরদা অবিশ্যি শেষ কথাগুলো আর শোনেননি, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা রান্নাঘরে! কাল থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, তার ওপর পায়ে 'ন' লেখা শুনে একেবারে আঁৎকে উঠলেন! মুখ না ধুয়ে, জলখাবার না খেয়েই গরু নিয়ে নদীর ধারের আমবনে চলে গেলেন। সেখানে নির্জনে গরুটাকে আদর করে বললেন—'নন্দিনী, মা-রে, আমাকে একটা বড় দেখে ডিম ভরা ইলিশ মাছ পাইয়ে দে দিকিনি।' অমনি বলা নেই কওয়া নেই, মাঝ নদী থেকে দামু হাক দিল—'ও ছোটবাবু, ইলিশ মাছ নেবেন ? আজ বড় জোর জাল ফেলেছি, তাই এটাকে বামুনকে দেব বলে মনে ভেবেছি।' পাড়ে নেমে মাছটি দিয়ে দামু বললে—'কি ছিরির গোরু গো, কিনলেন নাকি ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে ?' ঠাকুরদা হেসে বললেন—'দূর পাগল, এ গরু কি কেনে নাকি কেউ!' দামু বললে—'তা দানের জিনিসের দোষ ধরতে নেই। বেশ গরু।'

'দামু চলে গেলে গরুটার চারটে খুরে গড় করে, নিজের হাতে কচি কচি দুব্বোঘাস তুলে এনে খাওয়াতে লাগলেন ঠাকুরদা। তবে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না দুনিয়াতে। হিংসুটে পাড়ার লোকগুলো 'পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপের কথা গিয়ে থানার দারোগার কাছে লাগাল, এমন কি পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুর গোমস্তা দারোগাকে সঙ্গে করে এনে তাঁদের কুলপুরোহিতকে দিয়ে পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপ চিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা আরো অনেক দূরে গড়াত নিশ্চয়ই যদি না অতগুলো সাক্ষী থাকত। তা ছাড়া তাগা পেয়ে চুপ করে থাকা দূরে থাকুক, গিন্নী অষ্টপ্রহর বায়না ধরলেন ঐরকম ডিজাইনের হাঁসুলিও চাই। ইলিশ মাছটা খেয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের পেটের অসুখ করল।'

'তবু গিন্নীর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরদা পরদিন আমবনে গিয়ে

হাঁসুলি চেয়ে বসলেন। তোলা হাঁড়ির মতো মুখ করে গরুটা একবার তাকাল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর কাগের বাসায় খচ্‌মচ্‌ ঝটপট। ওপরে তাকিয়ে দেখেন, বাসার ধার দিয়ে হাঁসুলি একটুখানি ঝুলে রয়েছে। অগত্যা গাছে চড়ে সেটি উদ্ধার করতে হল। নামতে গিয়ে ডালসুদ্ধ ভেঙে পড়ে ডান হাতের কব্জিটা গেল মটকে, সর্বাঙ্গে ব্যথা। ট্যাঁকের মধ্যে হাঁসুলি আর বাঁ হাতে গরুর দড়ি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি আসবার সময় ঠাকুরদা ভাবলেন—সাধে কি নন্দিনীটাকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়েছে! ইচ্ছে পূর্ণ করে বটে, মা, কিন্তু সঙ্গে একটা করে লেজুড় জোড়ে কেন? সে যে বড় বালাই!'

তবু মানতে হচ্ছে, গরু পেয়ে কপাল ওদের ফিরে গেছিল। আসল ব্যাপার কাউকে না বলে, ঠাকুরদা ঠাকুমাকে শুধু বলেছিলেন—'গরুটা বড় পয়, নিজেই ওটার যত্ন করব।' ঠাকুরদা গরুর নাওয়া খাওয়া দেখতে লাগলেন, কিন্তু যে হাড়-জিরজিরে সেই হাড়-জিরজিরে অথচ বকরাক্ষসের মতো খিদে। যা দেওয়া যায় চিবিয়ে গিলে বসে থাকে। বালিশ বিছানা শীতের কাপড়, কোনো বাছবিচার নেই। ঠাকুরদা অবিশ্যি আবার সবই নতুন চেয়ে নেয়, কিন্তু সঙ্গে থাকে একটা করে ল্যাজ। নতুন বিছানা এল শিষ্যবাড়ি থেকে, কিন্তু বালিশে একটা কাঁটা ছিল, সেটা বড়দার মাথায় ফুটে যায়-যায় অবস্থা। নতুন র‍্যাপার পাওয়া গেল লটারি জিতে, কিন্তু হিংসা করে ফটিকবাবু দু-বাড়ির মাঝখানে বেড়ার দরমাটা বন্ধ করে দিলেন। এখন হাটে যেতে সদর ঘুরে যেতে হয়। ফটিকবাবুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ!

'তারপর বড়মেয়ের ভালো বিয়ে ঠিক করে দিল গোরুটা। আজকাল আর পয়সাকড়ির ভাবনা নেই, ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল, গাঁশুদ্ধ সবাই ধন্য-ধন্য করল, খাসা বর, ভালো ঘর। খোস-মেজাজে ঠাকুরদা তাঁর নিজের বিয়েতে যৌতুক পাওয়া সোনারপুরের খামারটি জামাইকে দান করে দিলেন। এই খামার কিনবার জন্যে ঐ ফটিকবাবুই কি কম ধরাধরি করেছে। তার মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা যে, বিলিয়ে দেবেন তবু ওকে দেবেন না। বিয়ের পরদিন জানতে পারলেন—বরটি আর কেউ নয়, ঐ ফটিকেরই ভাগ্নে এবং ফটিকই তার গার্জেন! অর্থাৎ তাকে দেওয়া মানেই ফটিককে দেওয়া।'

'একটা ছেলে ছিল ঠাকুরদার, তার বৌটি বড় লক্ষ্মী, কিন্তু ছেলেটা

একটা লক্ষ্মীছাড়া, কাজকর্ম করে না, সারাদিন আড্ডা। গরুর পায়ে ফুলচন্দন দিয়ে ঠাকুরদা ছেলের মতিগতি ফিরিয়ে একটা চাকরি পাইয়ে দিলেন। অমনি ছেলে গেল শুধরে, কিন্তু বৌয়ের রোয়াবের চোটে বাড়িতে কেউ টিকতে পারে না। গিন্নী পর্যন্ত তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না।'

'অগত্যা গরুকে বলে ছেলেকে তমলুকে বদলি করালেন ঠাকুরদা। অমনি নিজে পড়লেন ম্যালেরিয়ায়, জমিজমা কে দেখে তার ঠিক নেই; বলা বাহুল্য, এর আগেই গরুর সাহায্যে ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়েছেন। এদিকে পয়সাকড়ি যত বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে পাঁচগুণো! তিনতলা বাড়ি হল বটে, কিন্তু চোরের ভয়ে তার সব জানলায় শিক দেওয়া, বড় ফটকে পাহারাওয়ালা, বাগানে চৌকিদার, বাড়ি থেকে একটু বেরোবার জো নেই। তাছাড়া বড়লোকদের সঙ্গে এখন মেলামেশা, অথচ জামা গায়ে দিলেই ঠাকুরদার গা কুটকুট করে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, পাড়ার পাশার আড্ডাটি ছাড়তে হয়েছে। এমন কি সে পাড়া থেকেই উঠে নতুন রেল স্টেশনের কাছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছে! পয়মন্ত গরুটির জন্যে পাকা গোয়াল হয়েছে, কিন্তু তার হাড়-জিরজিরে চেহারাটি বদলায়নি, উপরন্তু বন-বাদাড় পুকুর পগারের অভাবে আর সম্ভবতঃ নিত্যি ফরমায়েস শুনে শুনে মেজাজটি হয়ে উঠেছে খিটখিটে। বুদ্ধি করে তার সেবাযত্নের ভার ঠাকুরদা বরাবর নিজের হাতেই রেখেছেন; তাঁর কান কামড়ে, পা মাড়িয়ে, গুঁতো মেরে, তাঁর ওপর রোজ সে রাগ ঝাড়ে। আজকাল তার কাছে কিছু চাইতেই ভয় করে। চাইলেই পাওয়া যায় কিন্তু ফ্যাকড়া সুদ্ধু নিতে হয়। এমন কি মাঝে মাঝে ঠাকুরদার মনে হয়, গরুটাকে তার আদি বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না? মানে জ্যান্ত অবস্থায়। তাই বলে তো আর—যাক্‌গে সে কথা।'

'এত দুঃখের ওপর ফটিকবাবুকে বেয়াই বলে ডাকতে হচ্ছে, তাঁকে চা জলখাবার দিতে হচ্ছে, গিন্নীর কাছে তাঁর বেজায় খাতির, এ বাড়ির সব ব্যবস্থা একরকম তাঁর কথামতোই হয়।'

'একদিন সন্ধ্যেবেলায় পাশার আড্ডার বন্ধুদের জন্যে আর সেখানকার ধামাভরা গরম মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজার জন্যে প্রাণটা যখন আঁক্‌পাঁক্ করছে, ঠিক সেই সময় হতভাগ্য ফটিক এসে বললে, 'সুখবর আছে,

বেয়াই। একফালে নিজেই কত পঞ্চায়েতের তাড়া খেয়েছ, কিন্তু এখন তোমার মতো একজন গণ্যমান্য লোক গ্রামের পঞ্চায়েতে না বসলে কি ভালো দেখায় ? তাই সেই ব্যবস্থাই করে এলাম। কি বলেন, বেয়ান ?'

'অমনি ঠাকুরমাও এক গাল হেসে বললেন—'বা, বেশ হয়েছে, সারাটা সন্ধ্যেই বাবু সেখানে আটকা থাকবেন তো ? এই সুযোগে ওঁকে দিয়ে গ্রামের তাসপাশার আড্ডাগুলোও তুলিয়ে দিতে হবে।'

'এই অবধি শুনে ঠাকুরদা সটাং গোয়ালঘরে গিয়ে নন্দিনীর কান মলে, ল্যাজ মুচড়ে বললেন, আর তো সহ্য হয় না মা! এক্ষুণি তুই ফটিকের হ!' তাই শুনে রেগেমেগে যেই না গরুটা অ্যাটাক করবার জন্যে চার পা এক জায়গায় জড়ো করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভু—স্ করে নন্দিনী ডিস্যাপিয়ার্ড। তার বদলে ঠাকুরদা দেখেন, হাতের মুঠোর মধ্যে অবিকল সেই গরু, মায় পেছনে 'ন' লেখাটাসুদ্ধু। এই নে, বিশ্বাস না হয়, দেখতে পারিস।'

গল্প শেষ করে বোকোমামা রেশমি রুমালটা দিয়ে মুখ হাত ঝাড়তে লাগল। গরু হাতে নিয়ে নগা বললে—'তা গোরুর অত রাগ কিসের শুনি ?'

বোকোমামা হাসল—'কি আশ্চর্য; রাগ হবে না ? ঠাকুরদা চাইলেন গোরুটা ফটিকবাবুর হক—হয়ে তাঁকেও খুব জ্বালাক। আর নন্দিনী বুঝল—তাকে স্ফটিকের তৈরি হতে হবে, কচি দুব্বো খাওয়া ঘুচবে! রাগ হবে না, বলিস কি ?'

ঠিক সেই সময় ছোটমাসি ছুটে এসে নগার হাত থেকে গরু ছিনিয়ে গালে ঠাস-ঠাস করে গোটা দুই চড় কষিয়ে বললে—'ফের আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস কি দেখবি মজা। কতকালের গরু, ঠাকুমা নিজের হাতে আমাকে দিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রীট থেকে কত কষ্ট করে আমার নাম নন্দিনীর ন লেখালুম, আর সেই গরুকে কিনা হতচ্ছাড়া এক্ষুণি হাত থেকে ফেলে নয়-ছয় করে দেবে!'

নন্দিনীর 'ন' শুনে আমরা সবাই থ। ওদিকে চড় খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে নগা বললে—'চাই না তোমার পচা গরু! যাক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে, আমি খুব খুসি হই!'

এই না বলে ছোটমাসির হাতের গরুকে যেই না সামান্য একটু ঠেলে দিয়েছে, অমনি হাত ফসকে শানের মেঝেতে গরু পড়ে খান-খান! আর

ইচ্ছেগাই

নগার পিঠেও বেদম জোরে গুমগুম !

কাষ্ঠ হেসে বোকোমামা বললে—'হলতো ? বলিনি পেছনে ফ্যাকড়া থাকে।'

পরীদের দেশে

দাদু ডেকে বললেন—'ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু শোন্। পরীদের দেশে গেছিস্ কখনো ?'

শুনে তারা তো হেসেই খুন ! পরীদের দেশ আবার হয় নাকি ? ও তো ঠাকুমাদের বানানো গল্প !

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন—'তবে কি আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠার মস্ত সিন্দুকটাও ঠাকুমাদের বানানো গল্প বলতে চাস্ ? যাঃ ! তোদের আর কোনো গল্পই বলব না !'

ওরা অমনি তাঁকে ঘিরে ধরল।

'না, দাদু, না ! বলতেই হবে তোমার ঠাকুরদার বাড়ির সেই চিলেকোঠার সিন্দুকের কথা !'

দাদু তো তাই চান। বললেন—'শোন্ তবে।'

'ঠাকুরদার বাড়ির ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঘরে ছিল কবেকার কার তৈরি করানো সিন্দুক—কে জানে ! এক-মানুষ উঁচু, আলমারির মতো দাঁড় করানো, কাঁঠালকাঠের তৈরি এক সিন্দুক। তার দরজার ওপর লাল রং দিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুণের প্যাঁচা আঁকা, তার নিচে সোনালী রং দিয়ে ছোট একটি দরজা আঁকা, তার মাঝখানে আবার ছোট্ট একটা চাবির ছ্যাঁদাও আঁকা ছিল।'

'যখন ছোট ছিলাম, রোজ অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম আঁকা চাবির ছ্যাঁদার চারদিকে চাবি ঘুরানোর দাগ কেন ?'

'সত্যিকার চাবির ছ্যাঁদায় চাবি ঢুকিয়েও ও সিন্দুক কেউ খোলে না, তবে আবার আঁকা ছ্যাঁদায় চাবির দাগ পড়ে কি করে ?'

'ঠাকুমা বলতেন, ষাট ষাট, চুপ চুপ, ও কথা মুখেও আনিস নে ! তোর ঠাকুরদার বাবার মানত করা সিন্দুক, ওতে চাবি লাগাতে নেই !

মাথা ঠেকিয়ে নমঃ কর এক্ষুণি !'

'আমিও তাই করতাম, আর আড়চোখে চেয়ে দেখতাম, আঁকা ছ্যাঁদার চারদিকে চাবির দাগ !'

সন্ধ্যেবেলায় পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতে আসতেন। তেলের লম্পের আলোতে অং-বং পড়া, সে যে কি কষ্ট তা আর তোরা কি বুঝবি ! আবার শব্দরূপ মুখস্থ না হলে— বাপ্‌রে, সে কি কান প্যাঁচানোর ধুম !'

'একদিন পড়া তৈরি করতে ভুলে গেছি। সন্ধ্যেবেলায় যেই না দূর থেকে সদরের উঠোনে পণ্ডিতমশাইয়ের খড়মের শব্দ শুনেছি অমনি দৌড়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে চিলেকোঠায় !'

'ঢুকেই দরজাটাকে ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়ে, ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁপাতে লেগেছি। চারদিক থমথম করছে, চুপচাপ, শুধু নিজের বুকের ধুক্‌পুক্ শুনতে পাচ্ছি, আর দূরে কোথায় একটা খোঁজ-খোঁজ ধর-ধর শব্দ !'

'যদি এখানে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে ? তবেই তো পুরনো দরজার খিল খসে পড়বে ! ইদিক-উদিক চাইতেই হঠাৎ দেখি—কালো সিন্দুকের আঁকা দরজায় ছোট্ট একটা সোনালী চাবি ঝুলছে !'

'আমি তো অবাক ! আঁকা দরজার ছ্যাঁদায় কে আবার চাবি এঁকে দিল ! এ ঘরে তো আমি ছাড়া বড় একটা কেউ আসেই না ! আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম। আঁকা তো নয়, সত্যিকার চাবি—ঘোরাতেই অমনি খুট্ করে খুলে গেল। আমি তো প্রায় মুচ্ছো যাই আর কি !'

'তারি মধ্যে কানে এল ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ করে কারা ওপরে উঠে আসছে। আর কথাটি না বলে চাবি ধরে টেনে আঁকা দরজাটি খুলে ফেলে, ভেতরে সেঁদিয়ে গেলাম।'

'কি রে টুনু মিনু নেলো খেলো ইলু বিলু, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিস্ যে বড় ? বলছি না, আঁকা দরজাটা টেনে খুলে ফেলে, ভেতরে ঢুকে, দরজাটা আবার বন্ধ করে, ঐ সোনালী চাবিটা দিয়েই ভেতর থেকে এঁটে দিলাম।'

'সেখানে ফুটফুট করছে আলো। সেই আলোতে চেয়ে দেখি হাতের চাবিটা কেমন যেন চেনা চেনা। মাথার ওপর ছোট্ট একটা হাতী বসানো, শুঁড়টা একটু বাঁকা, এইতো আমার মা-র মিনে করা

হাতে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, পেনসিল·

লীলা মজুমদার রচনাবলী ;

গয়নার বাক্সর সেই হারানো চাবিটা। সেই যেটাকে কোথায় রেখেছিলাম ভুলে গেছলাম, এই তো দিব্যি এখানে আঁকা দরজায় লাগানো ছিল! অথচ মা পয়সা খরচ করে নতুন চাবি করিয়ে রেখেছেন।'

'অমনি চারদিক থেকে দলে দলে সব ছেলেমেয়েরা এসে হাজির। কোন কালে কার সঙ্গে খেলা করেছি, কার সঙ্গে পড়েছি, তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। তারাই এখন আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এল। খুসিতে কেমন সবাই ডগমগ!'

'হাতে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, পেনসিল, বই, পেনসিল-কাটা-কল, একটা ইস্কুলের ব্যাগ অবধি! সব আমার হাতে গুঁজে দিতে চায়! আমি তো লজ্জায় মরি। এত জিনিস কারো কাছ থেকে নেওয়া যায় কখনো! ওরা বলে কি না—না না এ সব তোমারি জিনিস, এখানে ওখানে ভুলে ফেলে এসেছ, দেখ, চিনতে পার কি না, এই দেখ তোমার নাম লেখা!'

'তখন চারদিকে চেয়ে দেখি জায়গাটাও তো আমার চেনা জায়গা। এই তো এখানে ন্যাসপাতি গাছের তলায় ছোটবেলায় কত খেলা করেছি। এই তো গাছের গায়ে ছোট্ট কোটর থেকে সেই আমাদের চেনা কাঠবেড়াল মুখ বাড়াচ্ছে! সব ভুলে গেছলাম।

এ কোথায় এলাম, এ যে সবই চেনা, এ সবই যে আমার ছিল! কানের কাছে কে বললে—'চেরতা খেতে ভুলে গেলে চলবে কেন, এই নাও ধর।'

'চেয়ে দেখি সেই আমার ধাই মা! আরে, ধাইমার মুখটাও যে ভুলে গেছলাম। ধাইমার পায়ে পায়ে আমার ছোটবেলাকার উনুনমুখো সাদা বেড়াল ছানাও এসে উপস্থিত! ধাইমা তাকে সরিয়ে দিয়ে বললে—'ওসব এখন নয়, এখন বস, পড়া করতে ভুলে গেছ না? এই নাও ধর বই, সমস্কৃত শব্দ মুখস্থ করতে হবে না? ভুলে যেও না, এটা পরীদের দেশ, এখানে ওসব চালাকি চলবে না! আমি তো অবাক! পরীদের দেশ? এই নাকি সেই পরীদের দেশ, যেখানে যত রাজ্যের ভুলে-যাওয়া জিনিস সব পাওয়া যায়?'

'আহা ঐ তো আমার হারানো মার্বেলের ঢিবি, ন্যাসপাতি গাছের নিচে ছোট একটি পাহাড় হয়ে আছে! ঐ তো আমার খেলার বন্দুকটি, ঐ

যে আমার বনাত-মোড়া জলের বোতল ; ও দুটিকে ক-বছর আগে চড়িভাতি করতে গিয়ে কাদের বাগান-বাড়িতে যেন ফেলে এসেছিলাম, তার ঠিকানাও ভুলে গেছি !'

'এই তবে পরীদের দেশ ? আহা, কি ভালো ! আর যে এ সব দেখতে পাব তা ভাবি নি ! ঐ তো আমার বুড়ি দিদিমারা তিনজনই এখানে ! যখন পড়তে শিখিনি, কত পরীর গল্পই না বলেছেন আমাকে ! আহা, অমন মানুষদেরো ভুলে গেছলাম ! এরা যে ডানাওয়ালা পরীদের চেয়েও অনেক ভালো, অনেক ভালো। দু-হাত বাড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতে লাগলাম।'

দাদু এই অবধি বলে উঠে পড়লেন।—'আহা, অমন দেশ ছেড়েও লোকে ফিরে আসে ! ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু—তোরা তো নিত্যি সব ভুলে যাস ; চল্ চল্, আমার সাথে পরীর দেশে চল্ ! দেখবি, সেখানে তোদের জন্যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর অপেক্ষা করে রয়েছে !'

'আর দ্যাখ্, সঙ্গে কিছু টিপিন নিয়ে নিস্। ওখানে বড় খিদে পায়। খাবারের তো কোনোই ব্যবস্থা দেখলাম না সেখানে। থাকবে কোত্থেকে ? খেতে যে কেউ ভোলেনা ভুলে-যাওয়ার দেশে, খাবার কোথা পাবে গো ! তাই তো সেবার তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। চল্ চল্ —টিপিন নিয়ে চল্ রে—।'

সাগরপারে

ছোটবেলায় একবার পুরীতে গিয়ে একেবারে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট বাড়িতে ছিলাম। সারারাত ঘুমোয় কার সাধ্য। গুম-গুম্ করে বিরাট ঢেউগুলি অনবরত বালির ওপর আচড়ে ভাঙছে, আবার শোঁ শোঁ শব্দ করে জল সরে যাচ্ছে।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতাম, ভাঁটার সময় জলের ধারে ধারে ফসফরাস কেমন চিকচিক করছে, বালির ওপর লম্বা ঠ্যাং সাদা কাঁকড়াগুলো দৌড়োদৌড়ি করছে, ওদের ওপর জলের ছিঁটে পড়ছে, আর ওদের গা-ও চিকচিক করে উঠছে। দূর থেকে কেউ আসছে, কি করে যেন

টের পায় কাঁকড়ারা, আর অমনি সে-লোকটা দেখা দেবার আগেই, যে যার গর্তে লুকোয়। যারা গর্তের ভেতর বসে বালি কুরে কুরে বাইরে ফেলছিল, তারাও সব চুপ করে যায়। তারপর লোকটি চলে গেলে আবার হাজার হাজার কাঁকড়া বেরিয়ে এসে সামনের দিকে না এগিয়ে পাশ বাগে ছুটোছুটি করতে থাকে। মানুষকে ওদের ভারি ভয়।

তা হবে না-ই বা কেন? কতদিন সকালের দিকে দেখতাম, কাঁকড়া ধরে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় জড়িয়ে মালা গেঁথে নুলিয়ারা বাড়ি বাড়ি বেচছে। ঐ দিয়ে নাকি খাসা ঝাল চচ্চড়ি হয়, তাই বালি খুঁড়ে বাসার ভেতর থেকে ওদের টেনে বের করে মালা গাঁথা হয়।

ঐ নুলিয়ারাও একরকম বলতে গেলে সমুদ্রের জীব। কি চেহারা এক এক জনার! কালো কুচকুচে যেন কষ্টিপাথর দিয়ে খোদাই করা শরীর। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে, ইঁটের মতো শক্ত দেহ হয়ে গেছে ওদের।

শুনেছিলাম সমুদ্রের ওপারে বহুদূরের সব দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছে ওরা। লম্বা লম্বা নৌকো চেপে, প্রাণ হাতে করে এসে, সব এই বিদেশ বিভুঁয়ে থেকে গেছে।

জলের ধারে ওদের গাঁ-ও দেখেছিলাম। বাড়িগুলির চারপাশে ছোট ছোট ঢিবি সব মন্দিরের মতো ছড়ানো আছে। সেখানে ওদের দেবতাকে ওরা পুজো দেয়। সমুদ্রে যারা গেছে, তারা যেন আবার ফিরে আসে। প্রকৃতির একেবারে বুকের মধ্যে যারা বাস করে তারা জানে যে, বড় বিপদ এলে, আর মানুষের বুদ্ধি বা শক্তিতে কুলোয় না। তাই ওদের মেয়েরা নিত্যি সেখানে পুজো পাঠায়।

ওদের চোখগুলো যেন সদাই সমুদ্রের ওপারে কি খুঁজছে, এই রকম একটা দূর-দেখা ভাব। জলকে ওরা ভয় করে না। এই জলেই হয়তো ওদের বাপঠাকুরদারা প্রাণ দিয়েছে, তবু জলই ওদের খাওয়ায় পরায়, ওদের প্রাণের বন্ধু।

একবার দেখলাম, সন্ধ্যের দিকে জোয়ার এসেছে। বাতাস বইছে, আর তিনতলা সমান ঢেউগুলো তীরের ওপর আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। তারই মধ্যে নুলিয়াদের একটি ছোট ছেলে আমাদের বললে জলের মধ্যে একটি পয়সা ছুঁড়ে দিতে। যেই না দেওয়া, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সেই তুমল জলের রাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আমাদের বুক ঢিপ

এক মিনিটের মধ্যে পয়সা হাতে নিয়ে···

টিপ্ করতে লাগল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে পয়সা হাতে নিয়ে ছেলেটা জল থেকে উঠে এল। আরও পয়সা দিলাম ওকে আমরা, বার বার করে বললাম, প্রাণ নিয়ে অমন খেলা যেন আর কখনো না করে। হাসল ছেলেটি। আর তখুনি অন্যদের কাছে গিয়ে পেড়াপিড়ি করতে লাগল যেন জলে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। জলের ছেলের জলকে ভয় করলে কি আর চলে।

ভোরে ওরা নৌকো নিয়ে বেরুতো। কাঠ দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা নৌকো, অন্য সময় উপুড় করে বালির ওপর ফেলে রাখত, তলাটাও যাতে রোদ খেতে পারে। তার ছায়ায় বসে দুপুরে ওরা মাছ ধরার জাল বুনত, ছোট্ট একটা বাঁকা মতো মোটা কাঁটা দিয়ে সরু দড়ির ফাঁস জড়িয়ে জড়িয়ে দেখতে দেখতে একখানি জাল বুনে ফেলত।

সকালে উঠে ওদের নৌকো বেরুনো দেখতাম। সে এক ব্যাপার। ঢেউ যখন ডাঙা থেকে মাঝ সমুদ্রের দিকে যায়, সে সময় তার মাথায় চেপে বেরিয়ে যেতে হয়। নইলে মাঝখানকার নিচু জায়গাতে পড়লে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে বালির ওপর ফিরে আসতে হয়। ভাঁটা ধরতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না; দেখতে দেখতে দিগন্ত ছাড়িয়ে নৌকোগুলি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

বেলা বারোটা একটার সময় দেখতাম, ওরা মাছ নিয়ে ফিরেছে। বালির ওপর নৌকো বোঝাই মাছ ঢেলে দিত। কতক চেনা জানা মাছ, কত রকম বিলিতি নাম তাদের। ছোট ছোট মিষ্টি 'সামন', ঝকঝকে রুপোলী 'ম্যাকরেল', বিশালকায় তলোয়ার মাছ। তাকে দেখে প্রাণটা কেমন করে। পুরু চামড়ায় মোড়া প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বালির ওপর পড়ে থাকে, হাপরের মতো বুকটা ওঠে পড়ে, আর চোখে সেকি নিদারুণ বেদনা।

আমাদের নুলিয়া আড়াইয়া বলত—'বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় না ওর দিকে, মুখের ভাত ছাই-এর মতো লাগবে। দুঃখ কি শুধু মানুষদেরই ভাবো তোমরা?'

চেনা মাছের সঙ্গে অদ্ভুত সব রং করা, শুঁড় বের করা জন্তু নিয়ে আসত আড়াইয়া। বড় ঢেউ চলে গেলে পর বালির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনত চার ইঞ্চি লম্বা সমুদ্রের ঘোড়া। তার ঠ্যাং খুর কিছু নেই, আছে শুধু ঘোড়ার মতো একটা মাথা আর পাকানো একটা ল্যাজ। আর

আনত তারা-মাছ, তাকে হঠাৎ দেখে জানোয়ার বলেই মনে হয় না। হাতে নিতেই মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঘোড়া, তারা-মাছ কিলবিলিয়ে উঠত। আমরা বলতাম, 'আহা, জ্যান্ত আছে, আড়াইয়া। দাও, আবার জলে ফেলে দাও, নইলে এখুনি মরে যাবে।'

আড়াইয়া হাসত আর বলত—'ওর নাম লোকসানের খাতায় লেখা হয়ে গেছে, ও আর বাঁচবে না। সমুদ্রে ফেলে দিলেও ঢেউগুলো এখুনি ওদের আবার বালির ওপর আছড়ে ফেলবে। গভীর জলের জানোয়ার কি কখনো হাঁটু জলে বাঁচে?'

সত্যি বাঁচে না। একদিন একটা সমুদ্রের সাপ দেখেছিলাম, বড় ঢেউয়ের সঙ্গে এসে বালির ওপর অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। হলুদ আর ঘোর সবুজ ডোরা-কাটা, পাঁচ-ছয় হাত হয়তো লম্বায়। চোখের ওপরে শিং-এর মতো একটু উঁচু মতন। নড়তে পারছে না বালির ওপর। নুলিয়ারা বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে তিন চার জনে মিলে ধরে নিয়ে গেল।

তাই দেখে মনটা খারাপ লাগছিল। আড়াইয়া এসে কাছে বসে বলল—'সাপটার জন্য দুঃখু হচ্ছে বুঝি? জলের ধারে যদি থাকতে তাহলে জানতে, যা আসে তা নিয়ে নিতে হয়, যা ভেসে গেল, তার জন্য দুঃখ করতে হয় না।'

'আমার বাবার নৌকো একবার জলে ভেসে গেছিল। অনেকদিন মাছ পড়েনি ভালো, বাড়িতে খাবার কষ্ট। আমার ঠাকুমা আর মা তাই নিয়ে খুব রাগারাগি করেছিল। তাই আমার বাবা আর কাকা একদিন সকালে নৌকো নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি।'

'মা আর ঠাকুমা কেঁদে কেঁদে সারা, কিন্তু ঠাকুমার ছোট ভাই খালি বলে, 'আমি হাত গুণে দেখেছি, ওদের ছাই এখানকার মাটিতে মিশবে।' আমি তখন খুব ছোট, ঠাকুমা আর মা আর ঠাকুমার ঐ ভাই কত কষ্টে আমায় মানুষ করতে লাগল। এমনি করে এক বছর প্রায় কেটে গেল। একদিন খুব ঝড় উঠল, সে ঢেউ তোমরা ভাবতেও পারো না। বালি ডিঙিয়ে ওপরের ঐ সব সরকারী রাস্তা পর্যন্ত ঢেউয়ের মাথার ফেনা ছিটকে পড়তে লাগল।'

'সারারাত ঝড় চলল, ভোরের বেলায় সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমি বালির ওপর কাকার জলের বোতল কুড়িয়ে পেলাম। তার মধ্যে বাবার হাতের মাদুলি ভরা। তাই দেখে মা, ঠাকুমা এমনি কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে,

বুড়ো মামা আর তার কজন মজবুত বন্ধু দু-তিনটে নৌকো নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক দশদিন পরে বাবা কাকাকে নিয়ে ফিরে এল।'

'আমরা আড়াইয়াকে ঘিরে ধরতুম—'কোথায় গেছিল বল আড়াইয়া, এক বছর কোথায় ছিল ?'

'কাকা বলে, জলের নিচে যে অনেক সময় লুকোনো টান থাকে, তারি মধ্যে নাকি ওরা পড়ে গিয়েছিল। দু-দিন ভেসে, না খেয়ে, রোদে পুড়ে, ঢেউয়ে ভিজে, সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাথুরে দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ল ওদের নৌকো। তলা ভেঙে গেল, আর ভাসে না। দ্বীপে একটু তক্তা নেই যে জুড়ে নেবে। আছে শুধু ঝোপ-ঝাপ আর হাজার হাজার পাখির বাসা। ঝোপঝাপে অচেনা সব ফল, রাঙাআলুর মতো একরকম জিনিস, একটা মিষ্টি জলের ঝরণা, পাথরের ফাঁকে ছোট ছোট নোনা জলের পুকুর, তাতে নানা রকম মাছ।'

'না খেয়ে মরবার ভয় ছিল না, কিন্তু মানুষের মুখ না দেখে তারা হাঁপিয়ে উঠছিল। তখন একদিন কাকা বলেন, 'এই স্রোত তো উত্তর দিকে যায় ; জাহাজের খালাসিদের কাছে শুনেছি, বোতলের মধ্যে চিঠি পুরে সাহেবরা নাকি ভাসিয়ে দিত। এক হাজার মাইল দূরেও সে-সব বোতল কত সময় ভেসে উঠত।' ওরা লিখতে পড়তে জানে না। কাগজ নেই, কলম নেই ; তাই কাকার জলের বোতলে বাবার মাদুলি পুরে ভাসিয়ে দিল। সেই বোতল ছ'মাস বাদে আমি কুড়িয়ে পেলাম।'

'সমুদ্রের মাঝে মাঝে ঐ রকম পাথুরে দ্বীপ আছে এ দিকে, জাহাজগুলো খুব সাবধানে তাদের বাঁচিয়ে চলে। মামার জেদ চেপে গিয়েছিল, হাত গুণে সে দেখছে, বাবা-কাকা ঘরে মরবে। একটার পর একটা—দশটা দ্বীপ খুঁজে বাবা-কাকাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। মরেও যেমন লোকে, আবার বাঁচেও তেমনি।'

আড়াইয়া তার গলায় বাঁধা কালো সুতোয় গাঁথা একটা পলা আর একটা মুক্তো দেখিয়ে বললে—'এটা আসল মুক্তো, ঐ দ্বীপে ঝিনুকের মধ্যে বাবা পেয়েছিল। এদিকে নাকি মুক্তোর চাষ হয় না, তাই ওরা দলবল নিয়ে পরে দ্বীপগুলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল, কিন্তু আর পায়নি। কাকা বলে ঐ দ্বীপটাকেই আর ওরা খুঁজে পায়নি। অমনি নাকি সাগর থেকে মাথা তুলে ওঠে, আবার কোনদিন টুপ করে সাগরের বুকে তলিয়ে যায়।'

গল্প শুনতে শুনতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আড়াইয়া বললে—'চল তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ তোমাদের মাংস রান্না হচ্ছে, দেখে এসেছি, দেখি মা যদি আমাকেও দেয়।'

বড়লোক হবার নিয়ম

গত বছর ফুটবল সীজনের শেষের দিকে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। টিকিট পকেটে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ছোট্‌কা এলে এক সঙ্গে ঢুকব, এমন সময় একজন অচেনা লোক এসে কানে কানে বলল—'বড়লোক হতে চাও?'

বাড়িতে সর্বদাই সবাই বলে—অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে হয় না, তাই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। লোকটাও অমনি ফস্‌ করে ঘুরে ওপাশে গিয়ে ও কানে বলল—'বড়লোক হতে চাও না, সে আবার একটা কথা হল নাকি? নিজের মটর চাও না, যেখানে খুসি সেখানে যাবে। হাতঘড়ি, পার্কার কলম-পেনসিলের সেট, ট্র্যানজিস্টর রেডিও, রঙিন ছবি তোলার ক্যামেরা, বাইনোকুলার—তবে কি এসবও চাও না নাকি?'

আমি বললাম—'না।'

লোকটা অবাক হয়ে গেল। 'না, না আরো কিছু, খুব চাও। বড় বড় কুমীরের চামড়ার সুটকেস বোঝাই ভালো ভালো কাপড়-চোপড় থাকবে; জুতোই থাকবে সাত জোড়া' এই বলে আমার পুরনো জুতো জোড়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। আমি পা সরালাম। তাতে সে বলল—'কেমন শীতের সময় সুইটজারল্যাণ্ডে যাবে, পায়ে লম্বা লম্বা স্কি বেঁধে বাঁইবাঁই করে পাহাড়ের গা বেয়ে নামবে; পাহাড়ের ছাগলরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে। তারপর নিচে হোটেলের গরম ঘরে লাল, নীল, হলদে, সবুজ চকড়াবকড়া মোটা সোয়েটার পরে গরম কফি আর হরিণের মাংসের প্যাটি খাবে—চাও না এসব?'

আমি বললাম—'না। ঠাণ্ডা লাগলে আমার সর্দি হয়।'

সে দুঃখিত হয়ে বলতে লাগল—'শীতের সময় না হয় হাওয়াই দ্বীপেই যেও। যেখানে ঠাণ্ডার কোনো ভয় নেই। চারিদিকে নীল সমুদ্রের

ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার ঝুঁটি। বালির ওপরে নারিকেল গাছের তলায় বসে আনারসের সরবৎ খেও। মাঝে মাঝে নৌকো করে জেলেদের সঙ্গে বেড়িও, কেমন পরিষ্কার জলের নিচে রঙ-বেরঙের প্রবালের পাশ দিয়ে অদ্ভুত সব সমুদ্রের জীবদের সাঁতরে যেতে দেখবে। চাও না এসব দেখতে?'

আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। চোখ দু-টো কটা মতো, দাড়িগোঁফ কতকাল খেউরি হয় নি।

সে বললে—'নরওয়ে যাবে না? মাঝ রাতে সূর্য ওঠা দেখতে ইচ্ছা করে না? আকাশটা বেগনি রঙ ধরে, তাতে ফিকে সোনালির ছটা লাগে আর সূর্যটা মাটি থেকে একটু উঁচুতে আকাশের চারিদিকে কেবলি ঘুরতে থাকে। দেখবে না?'

আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালাম।

সে বললে—'নায়গারা জলপ্রপাত দেখবে না? সেখানে অষ্টপ্রহর রামধনু লেগে থাকে। ওল্ড ফেথ্‌ফুল বলে ওখানে একটা গরম জলের ঝরণা আছে, সাতান্ন মিনিট পর পর তার মুখ থেকে গরম জলের ফোয়ারা বেরোয়, চাও না সেখানে যেতে?'

আমি একবার নাক চোখ মুছে নিলাম।

লোকটা বললে—'তা হলে মিসর দেশে চল না। প্রাচীনকালের রাজাদের সমাধি কেমন ধনরত্ন দিয়ে ঠাসা থাকে দেখবে। গ্রীসের দু-হাজার বছরের পুরনো মূর্তি দেখবে না? ওখানকার ভাঙা থিয়েটারে এককালে সিংহ দিয়ে মানুষ খাওয়ানো হত, তা জানো? প্যারিসের আইফেল টাওয়ার দেখবে না?'

আমি দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম।

সে বললে—'আর সে কি খাওয়ার ধুম! একবার তার স্বাদ পেলে এসব ডাল ভাত চচ্চড়ি আর কোনোদিন মুখে রুচবে না। তন্দুরিতে রান্না হাঙরের কাবাব, দুধ আর পনীর দিয়ে সেদ্ধ বাচ্চা অক্টোপাস্, কচি কচি ব্যাঙের ঠ্যাঙ, বরফের পিপে থেকে তুলে লেবুর রস দিয়ে জ্যান্ত ঝিনুক, কত সময় খেতে গিয়ে দাঁতে মুক্তো কামড় পড়ে।'

আমার জিবে জল এল।

লোকটা বললে—'হনলুলুর কাছে সমুদ্রের ধারে ওরা যখন চড়িভাতি করে, পদ্মপাতায় জড়িয়ে সরু চালের ভাত কচি শুওরের মাংসের সঙ্গে

নারকোল দিয়ে মেখে, আগুনে তাতানো পাথরের উপর, গরম বালির নিচে পুঁতে রান্না করে। যে একবার খেয়েছে সে আর ভোলে না! এ সমস্তই তোমার মুঠোর মধ্যে।' এই বলে ফোঁস করে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম—'টাকা লাগবে না?'

'লাগবেই তো। এখান থেকে শুকনো মুখে কালীঘাট যেতে দশটা পয়সা লাগে, আর এতে লাগবে না, তাই কখনো হয়? কিন্তু টাকা পাওয়াটা এমন আর কি শক্ত ব্যাপার? যে কেউ টাকা করতে পারে, কেন করে না সেটাই বরং আশ্চর্য!' আমি তার চামড়ার তাপ্পি লাগানো ছেঁড়া জার্কিন, নীল রঙের ময়লা পেন্টেলুন আর জঘন্য ক্যাম্বিসের জুতোর দিকে তাকাতেই সে বলল—'ওঃ, এই দেখেই ঘাবড়াচ্ছ? পয়সা কখনো জাহির করতে হয় না, তা হলে রাজ্যের ফেউ পাছু নেয়। পয়সা থাকবে পকেটে লুকোনো, এই দ্যাখ।' এই বলে পকেট থেকে নস্যি লাগা দুর্গন্ধ রুমালের গিঁট খুলে বড় বড় সবুজ পাথরের একছড়া মালা দেখাল। কাষ্ঠ হেসে বলল—'এগুলো আসল পান্না, কম করে এটার দাম এক লক্ষ টাকা। এই রকম হাজার হাজার মালা আমার আছে। তোমারো খুব সহজেই থাকতে পারে। চাই কি এটাই তোমাকে দিতে পারি। অবিশ্যি যদি একটা কাজ করে দাও।'

ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম—'কি কাজ?'

লোকটা হাসল। 'অত ভয়ের কিছু নয়, ডাকাতও ধরতে হবে না, কুমীরের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে না। স্রেপ্ তোমার খেলার মাঠের টিকিটখানা আমাকে দিতে হবে।'

আমি বললাম—'কেন, তোমার এত টাকা, একটা টিকিটও কিনতে পার না?'

সে বললে—'আরে রামঃ! আমার ওসব চামড়ার গোলা নিয়ে লাথালাথি দেখার সময় আছে নাকি? বলে সে সময়টাতে আমার চাই কি হাজার টাকা রোজগার হয়ে যায়। ওটা চাই আমার ওস্তাদজীর জন্য, কামস্‌-কাটকা থেকে মাত্র একদিনের জন্য এসেছেন, কালই ফিরে যেতে হবে, কুড়ি বছর মোহনবাগানের খেলা দেখেন নি। এই সঙ্গে বলে রাখি, সেই তোমাকে এক দিনে লক্ষ টাকার মালিক করে দিতে পারে। একদিন আমিও তোমার মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম, এখন দ্যাখ,

এই বলে পকেট থেকে টুপ করে টিকিটটি তুলে নিয়ে·

লক্ষ টাকার পান্নার মালা কেমন দিব্যি স্বচ্ছন্দে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে আমার পকেট থেকে টুপ্ করে টিকিটটি তুলে নিয়ে, রুমালের পুটলিটা গুঁজে দিল। আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, সে জিভ কেটে বলল—'এই দ্যাখ, কি ভুলো মন আমার! কোটি কোটি টাকার হিসেব রাখার অভ্যাস ছোট জিনিস তাই ভুলে যাই। এই নাও, স্বয়ং ওস্তাদজীর হাতে লেখা বড়লোক হবার অব্যর্থ উপায় নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখো।'

আমার হাতে একটা শীলমোহর করা হলদে খাম দিয়ে লোকটা গেটের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট বাদে ছোট্কা এসে সব শুনে চটে কাঁই! 'তুই এরকম একটা ইডিয়ট জানলে অত কষ্ট করে তোর জন্য টিকিট যোগাড় করতাম না! ঐরকম সবুজ কাঁচের মালা শান্তিনিকেতনের মেলায় খুকুরা সাইত্রিশ পয়সা দিয়ে কিনেছিল! এখন যা, বুড়োআঙ্গুল চুষতে চুষতে বাড়ি যা।'

বাড়ি গিয়ে খাম খুলে দেখি তাতে লেখা—'মন দিয়ে পড়াশুনা করলেই বড়লোক হওয়া যায়।'

যাদুকর

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সে যে কী দারুণ বৃষ্টি সে আর কী বলব। চারদিক লেপেপুঁছে একাকার, ধোঁয়ার মতো জলের গুঁড়ো উড়ছে, তীরের মতো গায়ে বিঁধছে। 'উঃফ, ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁচলাম। ঘরে একটা তেলের বাতি জ্বলছে, দেখি আরামকেদারার ওপরে মাথা থেকে পা অবধি কালো চাদরে মুড়ি দিয়ে একটা লোক বসে রয়েছে, মুখটা তার তেকোনা, থুতনি থেকে খোঁচামতন একটু দাড়ি ঝুলছে। সামনে টেবিলের ওপর একটা হলদে-কালো ডোরাকাটা বিরাট বেড়াল, দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দু-হাত উঁচু হয়ে সটান বসে আছে।'

জগাইদা ঘরে ঢুকেই বসে পড়ে বলল—'এ কোথায় আনলি বল

তো? না আছে একটু শোবার জায়গা, না আছে একটু চায়ের ব্যবস্থা। নে, খাবারের থলেটা খোল। এখন ভিজে জুতো পরে আবার আমার সর্দি-টর্দি না লাগে। তোকে আমার আনাই ভুল হয়েছে। যা আস্তে আস্তে চলিস; নইলে এতক্ষণে বড় স্টেশনে পৌঁছে সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ধরে কদ্দুর এগিয়ে যেতাম বল তো।'

জগাইদা জুতো মোজা খুলতে লাগল, আমি খাবারদাবার বের করতে করতে বললাম—'আসতে তো আমি চাই-ই নি, তুমিই বললে ম্যাজিক শেখাবে, তাই—'

আরামকেদারা থেকে কালো-কাপড়-পরা লোকটি বলল—'কে ম্যাজিক শেখাবে?'

জগাইদা সেদিকে না তাকিয়েই বলল—'কে আবার শেখাবে, জাদুকর শেখাবে। নে, তাড়াতাড়ি কর। কতবার না বলেছি যে-সে অচেনা লোকের সঙ্গে ভাব পাতাবার দরকার নেই।'

এই অবধি বলেই জগাইদা হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে রইল। আমিও সেদিকে ফিরে একেবারে হাঁ! লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, গায়ের চাদর খসে গেছে, তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে কুচকুচে কালো গায়ে-আঁটা পেন্টেলুন আর ঢিলা আস্তিনের কালো কোট, হাতে একটা কালো ছড়ি, হাতলে একটা কুকুরের মাথার খুলি।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ বেঁকিয়ে দু-হাত উঁচু করে, সবুজ চোখ দিয়ে জগাইদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

লোকটা যে কী অদ্ভুত একটা হাসি হাসল সে আর কী বলব। মনে হল ছাদের কড়িবর্গাগুলো থেকে খিক খিক্ করে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। জগাইদা একটা ঢোক গিলে আমাকে একটা ছোট ঠেলা দিয়ে বলল—'চপগুলো আমি এনেছি, ওগুলো-আমাকে দে। তুই পাঁউরুটি দিয়ে পটল-ভাজা দিয়ে খা। ঐ ছোট সন্দেশটা নিস্। নিখুঁতি একটাই আছে, এদিকে দে।'

লোকটা তখনও খিকখিক করে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল—'খুব ভালো, খুব ভালো, চমৎকার ব্যবস্থা।'

আমার কেমন গা শিরশির করতে লাগল। তার ওপর বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, দরজা-জানলা খটখট করে নড়ছে, বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে

বিদ্যুতের চমকানি ঘরে ঢুকছে। ছাদ থেকে ঝোলানো তেলের ল্যাম্পটা মাঝে মাঝে দপদপ করে বেড়ে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে কমে যাচ্ছে।

জগাইদা কর্কশ গলায় আমাকে বলল —'হাঁ করে দেখছিস কী? চা আনতে হবে না?'

বললাম—'এই যে বললে চায়ের ব্যবস্থা নেই, বিশ্রী জায়গা। এত জলঝড়—'

জগাইদা দাঁত খিঁচুতে লাগল—'জলঝড় তো হয়েছেটা কী? গলে যাবি নাকি? ভারি আমার ব্রতী-বালক হয়েছেন, ছোঃ! উনি শিখবেন ম্যাজিক! তবেই হয়েছে! ওসব হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে এত ভয় করলে চলবে না, হ্যাঁ! এই আমি—'

এই অবধি বলতে না বলতে অন্য লোকটা একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জগাইদার সামনে দাঁড়াল। রাগে তার চোখ দু-টো একেবারে ছোট ছোট হয়ে গেছে, মুখটাকে দেখাচ্ছে একেবারে হলুদ! দাঁতে দাঁত ঘসে সে বললে—'কী বললি? হাতসাফাই? এত বড় একটা শাস্ত্রকে এভাবে অপমান কত্তে তোর এতটুকু বাঁধল না? আবার বলে ম্যাজিক শিখবে!'

চা না পেয়ে জগাইদাও রেগে ছিল। সেও তেড়েফুড়ে উঠল। 'হাত-সাফাই না তো কী? যতসব বুজরুগি, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা কামানো। সাদা কাগজে লেবুর রস দিয়ে মন্ত্র লিখে তারপর সেটাকে মোমবাতির উপর ধরে লেখাটা ফুটিয়ে, যত রাজ্যের আহাম্মুকদের অবাক করে দেওয়া। রেখে দিন মশাই, একেবারে কিছুই জানি না ভেবেছেন না কি? আপনার ঐ সব সঙের সাজ দেখে এ ছোকরা হাঁ হয়ে যেতে পারে। আমার আর সে বয়স নেই।'

লোকটা বললে—'কী! সঙের সাজ?'

তখন আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি বাস্তবিকই পরনে তার সাধারণ কালো কোট-প্যাণ্ট, হাতে কুকুরের-মাথা-দেওয়া ছড়ি, অদ্ভুত বলতে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু একটু আগেও—'

লোকটা জগাইদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—'জাদু করতে সাজের দরকার লাগে না, বুঝলে? আমি তোমাকে এক্ষুণি যে কোন একটা জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারি, তা জান?'

জগাইদা বললে—'ইল্লি?'

লোকটা আরো ঠাণ্ডা গলায় বললে—'এই যে বেড়ালটাকে

দেখছো, এটাকে ভালো করে নজর করে দেখো, এ কি সত্যি বেড়াল ভেবেছো না কি?' বলে বেড়ালটার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখি, এই এক্ষুণি দেখেছিলাম হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল তার সবুজ চোখ, আর এক্ষুণি দেখছি খয়েরি রঙের একটা খরগোশ —তার পাটকিলে রঙের চোখ।

সত্যি কথা বলতে কি, জগাইদাও একটু চমকে গেছিল। কিন্তু সেটা স্বীকার করবার ছেলেই সে নয়। কাষ্ঠ হেসে বলল—'ঢিলে জামার আস্তিনে হয়তো গোটা একটা চিড়িয়াখানাই নিয়ে এসেছেন। চাই কি, ওটাকে এখুনি একটা কুকুরছানা করে দিতেই বা আপত্তি কী?'

বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় লোকটা বললে—'কোন আপত্তি নেই।'

দেখতে দেখতে খরগোশটা একটা ঝাঁকড়া-চুল তিব্বতী কুকুর হয়ে গেল। সে আবার এমনি বদমেজাজী যে জগাইদাকে সারা ঘরময় তাড়া করে বেড়াতে লাগল। লোকটা বললে—'ব্যস, ব্যস, ঢের হয়েছে।' বলে তাকে কোলে তুলে নিল। খুব খানিকটা আদর করে আবার যখন তাকে টেবিলে বসিয়ে দিল, দেখি যে হলুদ-কালো ডোরাকাটা বেড়াল ছিল সেই বেড়ালই রয়েছে, সবুজ চোখ দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। লোকটা আবার আরামকেদারায় পা গুটিয়ে বসে বলল—'আসলে ও বেড়ালই নয়।'

জগাইদা হেসে বলল, 'বেড়াল নয় তো কী?'

'বেড়াল নয় তো তোমারই মতন একটা উদ্ধত ছেলে। তোমারই মতন পরীক্ষায় ফেল করে, জাদুবিদ্যা শিখতে আমার কাছে এসে আপাততঃ বেড়াল হয়েছেন। উড়নচড়ে ছেলেদের আমি এইভাবে শায়েস্তা করে থাকি।'

জগাইদা ভীষণ রেগে গেল। তোতলামি করে-টরে একাকার, 'ফ-ফেল করে মানে আবার কী? ফেল না করলেও জাদুবিদ্যা শেখা আমার জীবনের স্বপ্ন। প্রকাণ্ড হলঘর থমথম করবে, ঘরময় একটুখানি আলো জ্বলবে, কিন্তু মঞ্চের ওপরে দু-টো প্রকাণ্ড বাতি রাতকে দিন করে রাখবে। আর তারই নিচে আঁটো কালো পেন্টেলুন আর ঢিলে আস্তিনের কোট পরে আর মাথায় কালো উঁচু টুপি দিয়ে আমি থাকব, আর আমার উলটোদিকে থাকবে আমার শাকরেদ। আমার হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে সামনে পর্দা টেনে দেবে, তবু আমি কোঁ কোঁ করে

বেহালা বাজাব—কী রে, বড় যে হাসছিস ?'

কী আর করি, বললাম—'ইয়ে—মানে হাত-পা খোলা থাকলেও তুমি বেহালা বাজাতে পার না।'

জগাইদা ব্যস্ত হয়ে বলল—'আরে, তাই তো বলছি, ঐখানেই তো হাতসাফাই বিদ্যে লাগে। ওরা পর্দা সরিয়ে দিল, যেমন-কে-তেমন হাত-পা বাঁধা চেয়ারে বসে আছি, বেহালাটা দূরে মাটিতে পড়ে। ঐটেই তো আমাকে শিখতে হবে। ঐ বুজরুগিটুকুন।'

লোকটা বললে—'সব বুজরুগি, না ? বুজরুগিটুকু শিখতে পারলেই হয়ে গেল ! বাঃ ! হুদিনির নাম শুনেছিস, ছোকরা ? তাকে হাত-পা বেঁধে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সে পুরে, ছ-ইঞ্চি লম্বা আটচল্লিশটা পেরেক ঠুকে ঐরকম রাতকে-দিন-করা আলোর নিচে ফেলে রাখা হত। চারধার ঘিরে দর্শকরা বসে থাকত। তবু সে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসত। তারপর সে বাক্স খুলতে মিস্ত্রি ডাকা হত। তারা যন্ত্রপাতি দিয়ে পেরেক তুলে, ঢাকনি উঠিয়ে দেখত ভেতরে হাত-পা বাঁধার শেকল পড়ে আছে, হুদিনির রুমাল পড়ে আছে—কিন্তু হুদিনি বাইরে। তাকেও কি বুজরুগি বলিস ? জানিস, একবার রাশিয়ার জার তোরই মতো ওর জাদুবিদ্যাকে বুজরুগি প্রমাণ করবার জন্যে, হুদিনির হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে রেলগাড়ির সীল-করা কামরায় পুরে, কামরার বাইরে পাহারাওলা বসিয়ে রেলগাড়িটাকে সাইবেরিয়া রওনা করিয়ে দিয়ে বলেছিল, রাত আটটার সময় সেজেগুজে আমার সভায় আসবে। রাত আটটায় গাড়ি তখন দুশো মাইল দূরে চলে গেছে, কিন্তু হুদিনি ঠিক সেজেগুজে রাজসভায় এসে হাজির হলেন। টেলিগ্রাফে জানা গেল সীল-করা গাড়ি তখনো সাইবেরিয়ার দিকে ছুটেছে, একবারও থামে নি। কিন্তু গাড়িতে হুদিনি নেই। এই সবই বুজরুগি বলতে চাস ?'

তারপর কত যে তর্কাতর্কি করতে লাগল দু-জনে। ঘুমে আমার চোখ বুঁজে আসছিল। আমি অন্য আরামকেদারাটায় শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে দেখি, চারিদিক একেবারে চুপচাপ, আলোটা যেন আরো কমে এসেছে, কালো-পোশাক-পরা লোকটা তার চেয়ারে বসে ঢুলছে, তার সামনে একটার জায়গায় দু-টো হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল। জগাইদা কোথাও নেই।

তার সামনে একটার জায়গায় দুটো হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল

যাদুকর

কী আর বলব, আমার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। লোকটি একটু হেসে বলল—'কাকে খুঁজছ? এমনি করে আমার বেড়াল বাড়াই। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, এই বেশি ভাল না? এতকাল তোমার ওপর তম্বি করে এসেছে, এখন পরীক্ষা করে দেখতে পার কেমন পোষ মেনেছে। নাও, ভয় কিসের, দেখো যা বলবে তাই করে কিনা?'

আমি বললাম—'কো—কোনটা সে?' লোকটা শুনে হেসেই কুটোপাটি—'সে কি আর অত করে বলা যায়? দু-জনকে একই জাদুমন্ত্র দিয়ে এক্কেবারে অবিকল এক করে দিয়েছি যে। আর আলাদা করবার দরকারই বা কী? জোড়া বেড়ালের খেলা দেখাব।' বলে আঙুল তুলে বলল—'খেল্ দেখাও ভাইসব।' আর বেড়াল দু-টো অমনি ওর আঙুল নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনো ওঠে, কখনো নামে, কখনো লাফায়, কখনো কিলবিল করে। একবার কুস্তিও দেখাল।

দেখে দেখে আমি ত অবাক। লোকটা বলল—'ভয় কিসের? এবার সাধ মিটিয়ে ওকে নাচাও। অনেক ত সহ্য করেছ।'

আমি বললাম—'এই চরকিবাজি খাও দিকিনি।' বলে আঙুল ঘুরিয়ে দেখালাম। তাই দেখে বেড়াল দুটোও চাকার মত ঘুরতে লাগল। আমি বললাম—'চোপ'। অমনি তারা থেমে গেল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ও কি হল ভাই? আমি ভাবলাম তুমি খুসি হবে।' আমি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। 'বেচারী জগাইদাকে বেড়াল করে দিও না। ও ইঁদুর দেখলে ভয় পায়।'

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল—'আর কেঁদো না, এই দেখো, ওকে আবার মানুষ করে দিচ্ছি। চোখ বুঁজে মুখ গুঁজে একটু শোও দিকিনি। যা, বিল্লি যা তো, জগাই হয়ে চা আন; ভোর হয়ে গেছে। নিজের একার জন্য না, আমাদের সকলের জন্য আনিস। স্বভাবটাকে বদলে ফেলিস।'

বলতে না বলতে ঘরের দরজা খুলে গেল, পাখিদের কিচিমিচি কানে এল, চোখ খুলে চেয়ে দেখি, জগাইদা সঙ্গে করে চা-ওলা নিয়ে ঢুকছে, রাত কেটে গেছে, বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আর টেবিলের ওপর একটা বেড়াল থাবা চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। চমকে গিয়ে লোকটার দিকে চাইতেই সে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল।

জগাইদার দেখি মেজাজটা খুব খুসি। ঠোঙায় করে নানখাটাই বিস্কুটও কিনে এনেছে। একগাল হেসে আমাদের খাওয়াল, নিজেও খেল। তারপর আমরা রওনা হবার আগে লোকটাকে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বলল—'ভাই ঠিক থাকল স্যার, লেখাপড়া শেষ করেই শিখব। চল রে, বাড়িই ফেরা যাক, মা আবার ভাববে।'

শুনে আমি চমকে গিয়ে আধ হাত লাফিয়ে উঠলাম, মাসিমার ভাবনার জন্য জগাইদার এত মাথাব্যাথা কবে থেকে হল ? লোকটা আমার কানে কানে বলল—'অবাক হবার কিছুই নেই। কে জানে কোন ছেলেটাকে 'জগাই করতে কোনটাকে জগাই করেছি।'

জগাইদা বাইরে থেকে ডাক দিল—'ওরে, আয় রে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে যে রে। বড় স্টেশনে তোকে লুচি তরকারি খাওয়াব। তাহলে চলি, স্যার।'

আজকাল মাসিমা প্রায়ই বলেন—'ঐ একবারটি ফেল করে জগাই আমার একেবারে বদলে গেছে, অমন ছেলে হয় না।'

আসলে কতখানি যে বদলেছে তা মাসিমাও জানেন না।